১.

আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম বিংশ-শতাব্দিতেই। ফরাসি দেশে সূচনা হওয়ার পর ইংরেজি হয়ে বাংলায় এর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্যের আধুনিক ছোটগল্পের গুরুগোষ্ঠী হচ্ছেন: হেনরি জ্যামস, ও. হেনরি, ই. টি. এ্যা. হফম্যান, এ্যানটন চেখোভ, ক্যাফকা, ডি. এইচ. ল্যাওরেন্স, ক্যাথেরিন ম্যান্সফিল্ড, শেরউড এ্যান্ডার্স, অ্যারনেস্ট হেমিংওয়ে, ক্যাথেরিন অ্যান পোর্টার, জন ও'হ্যারা, ফ্যানেরি ও'কোর্ণর, জে. জি. স্যালিংগ্যার, জন চীভার, জন আফদিকে, ডোন্যাল্ড ব্যার্থেল্মে ও র‍্যায়মোন্ড ক্যার্ভের, এ্যডগ্যার অ্যালান পো, গ্যাই ড্যা ম্যাপাসেন্ট।[১] এ্যডগ্যার অ্যালান পো ইংরেজি ভাষায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ছোটগল্প হবে 'শর্ট প্রোজ ন্যারেটিভ'; আকৃতি[২] হবে ছোট, এক 'বসায়' যাতে সম্পূর্ণ গল্পটি শেষ করা যায়। ছোটগল্পে থাকবে একক উপলব্ধির সঞ্চার, থাকবে আখ্যান ও ঘটনা। প্রকৃতি নির্মিত হবে একটি বিশিষ্ট বা একক অভিব্যঞ্জনার মাধ্যমে।[৩] এ্যডগ্যার অ্যালান পো প্রধানত সংরূপ-প্রকরণের কথাই বলেছেন; অন্যদিকে ব্রান্ডার ম্যাথিউজ ছোটগল্প সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ও যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে গিয়ে চারটি লক্ষণ বিকল্পহীনভাবে আবশ্যিক বলে উল্লেখ করেছেন, 'একক চরিত্র, একক ঘটনা, একক অনুভূতি বা প্রতীতি ও একক পরিবেশ'[৪]; কিন্তু এ-সংজ্ঞার সমস্যাটি হচ্ছে, এক-চরিত্রের সঙ্গে অন্য-চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে যে অনুভূতি জেগে ওঠে তা সৃষ্টি করা কঠিন বা অসম্ভব প্রায়। এ্যানটন চেখোভের 'ডার্লিং' একটি একক চরিত্র বিশিষ্ট সার্থক ছোটগল্প। রুডিয়ার্ড কিপলিং ছোটগল্পের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন, '[...] লণ্ঠনের আলো যেমন চারিদিকের অন্ধকারকে অক্ষুণ রেখে একটিমাত্র স্থানকে বা দ্রব্যকে দেখায়, ছোটগল্প তেমনি একটি মাত্র ঘটনা বা ভাবকে প্রকাশ করে।'[৫] অন্যরা বলেছেন, ছোটগল্প সাধারণত একটি শৈল্পিকভিত্তিক বর্ণনাধর্মী, চিত্রধর্মী সাহিত্যকর্ম বা 'গতিময় জীবনযাত্রার পথের একটি ক্ষণিক বৈচিত্র্যপূর্ণ চমৎকার দৃশ্যের মনোরম চলচ্চিত্র'[৬]। বাংলা ছোটগল্পের সংজ্ঞাগুলো হচ্ছে:

১. 'অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে/ শেষ হয়ে হইল না শেষ।'[৭]
২. 'ছোটগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই।'[৮]
৩. 'ছোটগল্পের উদ্দেশ্য জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা, মনের একটি স্বতন্ত্র ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি সংঘটন সাধন।'[৯]
৪. 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা কোনও পরিবেশ বা কোনও মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'[১০]

এসব সংজ্ঞা থেকে একটি সার্থক ছোটগল্প নির্ণয়ের 'পঞ্চতন্ত্র' নিষ্কাশন করে নেওয়া যায় :

১. ব্যক্তিমনের নিজস্ব অনুভূতি, গ্রন্থি বা সঙ্কটবোধকে ব্যক্ত করতে একক প্রতীতির উদ্ভাসন ও ব্যঞ্জনাকে ধারণ করা।

---

[1] Henry James, O. Henry, E. T. Hoffmann, Chekhov, Kafka, D. H. Lawrence, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, Ernest Hemingway, Katherine Anne Porter, John O'Hara, Flannery O'Connor, J. D. Salinger, John Cheever, John Updike, Donald Barthelme, Raymond Carver; Edgar Allan Poe and Guy de Maupassant.

[2] 'If any literary work is too long to be read at one sitting, we must be content to dispense with the immensely important effect derivable from unity of impression for, if two sittings be required, the affairs of the world interfere, and every thing like totality is at once destroyed.' Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition, April 1846, Graham's Magazine.

[3] 'We need only here say, upon this topic that, in almost all classes of composition, the unity of effect or impression is a point of the greatest importance. It is clear, moreover, that this unity cannot be thoroughly preserved in productions whose perusal cannot be completed at one sitting. We may continue the reading of a prose composition, from the very nature of prose itself, much longer than we can persevere, to any good purpose, in the perusal of a poem. This latter, if truly fulfilling the demands of the poetic sentiment, induces an exaltation of the soul which cannot be long sustained. All high excitements are necessarily transient. Thus a long poem is a paradox. And, without unity of impression, the deepest effects cannot be brought about. Epics were the offspring of an imperfect sense of Art, and their reign is no more. A poem too brief may produce a vivid, but never an intense or enduring impression. Without a certain continuity of effort - without a certain duration or repetition of purpose - the soul is never deeply moved ... Extreme brevity will degenerate into epigrammatism; but the sin of extreme length is even more unpardonable.' Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition, April 1846, Graham's Magazine.

[4] 'A true short-story is something other and something more than a mere story which is short. A true short-story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression. In a far more exact and precise use of the word, a short-story has unity as a novel cannot have it [...] A short-story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions called forth by a single situation.' The Philosophy of the Short-Story, Brander Mathews, Lippincott's Magazine, 1885.

[৫] আমিনুল ইসলাম, সময় ও সাহিত্য, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

[6] 'In its various stages of development the short story has frequently been compared with some other literary form, sometimes with some artistic form outside literature. It is thus declared to have affinities with the drama; with the narrative ballad; with the lyric and the sonnet. In the last thirty years it has shown itself, as in fact much other writing has, to be pictorial rather than dramatic, to be more closely allied to painting and the cinema than to the stage. Mr A. E. Coppard has long cherished the theory that short story and film are expressions of the same art, the art of telling a story by a series of subtly implied gestures, swift shots, moments of suggestion, an art in which elaboration and above all explanation are superfluous and tedious.' H. E. Bates, The Modern Short Story, London, 1941.

[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষাযাপন', সোনার তরী, ১৮৯৩।

[৮] প্রমথ চৌধুরী, ছোটগল্প, রচনা– ১৯১৮।

[৯] নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'ভূমিকা', বাংলা ছোটগল্প, ১৯৫০।

[১০] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৯৫৬।

২. ন্যূনতম চরিত্র সংখ্যায় একটি চলিষ্ণু ও গতিশীল ঘটনাকে অবলম্বন করে, বাস্তবের সত্যস্পন্দন ধারণ করে, কাবিত্বমণ্ডিতোপাদানের সার্থক মিশ্রণ ঘটানো।
৩. অল্প পরিসরে সুনিশ্চিত বাস্তবধর্মী জীবনভিত্তিক একটি ক্ষণের বৈচিত্র্যপূর্ণ চমৎকার দৃশ্যের মনোরম চলচ্চিত্র।
৪. ছোটগল্প ও কবিতার মধ্যে একটি সুগভীর অঙ্গসংস্থান স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাস।
৫. বাহুল্যবর্জিত এবং লক্ষ্যাভিমুখী ঋজুগতি।

বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম আধুনিক ছোটগল্পের অনুসন্ধান করলে দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনীর ওপর। বাংলা-সাময়িকপত্রের প্রথম যুগের প্রথম-পর্ব (১৮৩২-৩৩) ও দ্বিতীয়-পর্ব (১৮৭০-৭২) থেকেই ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনীগুলো প্রকাশ পায়। পাঠক-চিত্তবিনোদন, লেখকের নাম না-থাকা এসব ক্ষুদ্রাকার-গদ্যকাহিনী বা 'চূর্ণক'গুলোই বারো-তেরো ছত্রে রচিত ছোটগল্প, প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পন', 'বিবিধার্য সংগ্রহ', 'উপদেশক' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' সাময়িকপত্রে। তারপর প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' গ্রন্থের দু-একটি কাহিনীর মধ্যে 'পূর্ণদেহ' ব্যাঙ্গাত্মক ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।[১১] দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৭২) গল্পটি হচ্ছে, আর-কোনও আধুনিক বাংলা ছোটগল্প আবিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত, বাংলাসাহিত্যের প্রথম সুনির্মিত ও নিপুণ আধুনিক ছোটগল্প। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বনিঃসৃত ঐক্যপ্রতীতি, সমকালীন বাস্তব ধারণা, একমুখী গতি, চমৎকার চলিষ্ণুতার প্রচেষ্টা, আখ্যানের বিকাশ ও সঙ্গতি বর্তমান। শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ১৮৭৩) বাংলাসাহিত্যের আর-এক অপূর্ব ছোটগল্প। ব্যক্তিমানুষের সঙ্কটবোধ, নীতির সঙ্গে নীতির দ্বন্দ্ব ও বর্ণনার বিস্তারে নির্মিত একটি চমৎকার ছোটগল্প; কিন্তু আখ্যানটি মৌলিক নয়, টেনিসনের 'ইনোক আর্ডেন' (১৮৬৪) কাব্যকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের জগতে, তারপরই, পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘাটের কথা' (ভারতী, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪), 'গল্পগুচ্ছ'-এর প্রথম গল্প। গল্পটি সুখরঞ্জন রায়ের মতে 'লিরিক ও ছোটগল্পের সীমান্তদেশের রচনা'[১২] ও 'ছোটগল্পের স্ফুটগৌরবে'[১৩] অপ্রকাশিত; সুকুমার সেনের ভাষায় 'গল্পচিত্র'[১৪]; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে 'গল্পাভাস'[১৫]; ভূদেব চৌধুরীর কথায় 'উপাখ্যান'[১৬]; আর শিশিরকুমার দাশের মন্তব্য, 'সুরচিত গদ্যে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ গেঁথে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কাহিনীর আরম্ভ করতে পারেননি। [...] স্বল্পপরিসরে, স্বল্পকথায় জীবনের একটি গভীর মুহূর্ত কিংবা একটি ব্যঞ্জনাভরা ইঙ্গিতে ঘটনার অতর্কিত অবসানকে লেখক কাহিনীর মধ্যে ধরতে শেখেননি।'[১৭] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' (হিতবাদী, ১৮৯১) হচ্ছে বাংলাসাহিত্যের একটি নিটোল ছোটগল্প, সন্দেহাতীত। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান সঙ্কলন তিন খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' এবং 'তিনসঙ্গী'। প্রথম স্তরে নিটোল রসপুষ্ট কাহিনী, গল্পগুচ্ছের প্রথম দুই খণ্ডে। দ্বিতীয় স্তরে [...] বুদ্ধির অতিরেক এবং তত্ত্বপ্রাধান্য–গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ড। 'তিনসঙ্গী'–তৃতীয় স্তর। অতি আধুনিক মননপ্রধান জীবনধারার সমস্যা। তাঁর ছোটগল্প প্রকৃতিরস, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্বন্ধ এবং মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় পূর্ণ।'[১৮] স্বতন্ত্র মেজাজের শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলো প্রকাশিত হয় ১২৯৮-১৩০০ বঙ্গাব্দে। তার গল্পের আকার অনির্দিষ্ট হলেও ভিন্ন ধরনের এক জীবনচেতনার সূচক, পরিবেশ–আড্ডা, সেখানে হরেক লোকের সমাবেশ, সমাজমনের সম্মিলিত সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখনশৈলীতে লোকায়ত সাহিত্যের পন্থাগ্রহণ করেছেন অনেকটা। তার গল্প গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মজার গল্প' ও 'ডমরু চরিত' প্রভৃতি।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের আগেই বাংলাসাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের বাঁকপরিবর্তন হয়; আর এই নবতর বাঁকটি চিহ্নিত করতে অবদান রেখেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সহজ রসের রসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন, যেমন 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবিথী' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭) প্রভৃতি। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত আবেগপ্রবণ শিল্পী; পারিবারিক জীবনের রূপাঙ্কন, পল্লীজীবনের বাস্তবচিত্র তাঁর রচনায় সুলভ। প্রমথ চৌধুরী একটি ফরাসি গল্পের[১৯] অনুবাদ 'ফুলদানি' (সাহিত্য, ১২৯৮) দিয়েই আধুনিক ছোটগল্পের একটি অভিনব অনুপম বাঁক সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু গল্পটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপত্তি তোলেন, 'বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়–ইহাতে বাঙালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে।'[২০] তবুও একথা অস্বীকার্য যে, বাংলা আধুনিক ছোটগল্পের নতুন ধারার স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরী 'নতুন বাঁকের আর নতুন

[১১] ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ২০০০।
[১২] সুখরঞ্জন রায়, রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র, ১৩৮৩।
[১৩] সুখরঞ্জন রায়, রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্প-সূত্র, ১৩৮৩।
[১৪] সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ১৩৫৩।
[১৫] প্রভাতকুমুর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড), ১৩৭৭।
[১৬] ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা, ১৮৯২।
[১৭] শিশিরকুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, ১৯৯৫।
[১৮] ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ২০০০।
[19] Prosper Merimee, Le vase étrusque, 1830.
[২০] সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

মর্জির'[২১] আধুনিকতা নিজের মৌলিক প্রতিভায় একাই সৃষ্টি করেছেন। প্রমথ চৌধুরী তার 'চার ইয়ারি কথা' বা 'নীললোহিত'-এর গল্পগুলোর মাধ্যমে পাঠকের কাছে আবেদন রেখেছেন। 'চার ইয়ারি কথা'-র গল্পের পটভূমি–প্রথমটিতে কলকাতার গঙ্গার ঘাট, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে ইংল্যান্ড, চতুর্থটি কলকাতায় বসে বিলাতের স্মৃতিচারণা; বিষয়বস্তু–'সমাজ ও পরিবারের চাপের বাতাবরণ-বিচ্ছিন্ন, মুক্ত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক মনঃসম্পর্কের ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-সূর্যতাপ এবং সেইসঙ্গে মন্দ সমীরণ, জ্যোৎস্নালোক আর অশ্রুতপূর্ব সুরের রেশ। এই সম্পর্কের চিত্ররূপে কোনও ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দের অনুশাসন নেই। নেই কোনও তথাকথিত নৈতিকতা।'[২২] জলধর সেনের গল্পে গ্রাম্যজীবনের চিত্র ও ঘরোয়া পরিবেশ ফুটে উঠেছে। তার গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'নৈবেদ্য' (১৯০০), 'পরাণ মণ্ডল' (১৯০৪), 'নূতন গিন্নী' (১৯০৭), 'আমার বর' (১৯১৩) প্রভৃতি। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহগুলো হচ্ছে 'পাথেয়' (১৯৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২), 'মা ফলেষু' (১৯৩৫) প্রভৃতি।

নজরুল বাংলাসাহিত্যের জগতে শুধু কবিতার জন্যেই নয়, ছোটগল্পের জন্যেও যুগস্রষ্টা। তাঁর ছোটগল্পে কবিতার মতো শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বার বহন করে। প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডে অর্থাৎ প্রচলিত ছোটগল্পের আঙ্গিক ও রূপনীতির কাঠামোতে ফেলে কিংবা রচনা-সৃষ্টির প্রচলিত শিল্পরূপে বিচার করতে গেলে নজরুলের ছোটগল্পের প্রকৃতি ও চরিত্রের নির্ণয় বা মূল্যায়ন খুবই দূরুহ। নজরুল তিনটি ছোটগল্পের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন–'ব্যথার দান'[২৩], 'রিক্তের বেদন'[২৪] ও 'শিউলিমালা'[২৫]। তিনটি গ্রন্থে মোট আঠারোটি গল্পের মাধ্যমে প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, প্রেমকর্তব্যের সংঘাতে সৃষ্ট ট্র্যাজেডি, মৃত্যু, যুদ্ধযাত্রা, দেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, দেশ ও জাতির মুক্তি–অর্থাৎ রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ছিলেন সকল অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন দ্রোহী। একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মাতৃঋণ, স্বদেশের ঋণ শোধ করার উন্মাদনা ও আদর্শায়িত একটি মাতৃমূর্তির অন্বেষণ, যা ছিল কবির কাছে 'জগজ্জননীস্বরূপা মা'।

বিভূতিভূষণের আত্মমগ্ন প্রকৃতিদৃষ্টি, তারাশঙ্করের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সম্মিলিত প্রেক্ষিতে দেশের পরিবর্তনশীল রূপ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনের অচেনা পটভূমি থেকে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ফ্রয়েডিয় ও মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগপরীক্ষা, বনফুলের উপরিতলের জীবনের চঞ্চল ঝিকিমিকি ও অণুগল্পের সূচনা, সতীনাথ ভাদুড়ির রাজনৈতিক বীক্ষা, শরদিন্দু বন্দ্যোপ্যাধায়ের ইতিহাসপ্রয়ান–এসবই বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। করেছে পরশুরামের গল্পগুলোও–'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), 'নীলতারা' (১৯৫০), 'দুস্তরী মায়া' (১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি' (১৯৫৩) প্রভৃতি।

বাংলা গল্পের 'প্রকৃতি' বদলাতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক। প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পসংকলন 'পলায়ন' (১৯৪০) ও 'প্রজাপতয়ে' (১৯৪২), সোমেন চন্দের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ইঁদুর' (বৈশাখ ১৩৪৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ফসল ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২), সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩' (১৯৪৩), শান্তি ভাদুড়ীর 'কিউ' (বৈশাখ ১৩৫০), সমরেশ বসুর 'আদাব' (১৯৪৬), রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' (১৯৪৭), কমলকুমার মজুমদারের 'জল' (১৯৪৮) প্রভৃতি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালির জীবন-নীতি ও জীবন-ভাষ্য অবলম্বনে নতুন এক সামাজিক গল্পের ধারা সৃষ্টি করতে শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। ক্রমে এই ধারার পথ বদলে ফেলেন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায় প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে 'নতুন রীতির গল্প' লিখতে শুরু করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, কার্তিক লাহিড়ী প্রমুখ। ষাটের দশক থেকে গল্প প্রকাশ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। পরবর্তীতে এলেন বাণী বসু, সূচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ। এরই মাঝে শিল্প-ভুবনের অদ্ভুত আলো উদ্ভাসিত হয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুল বাশার প্রমুখ লেখকদের গল্পে।

বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের যে-অর্জন, যে-অবস্থান বা যে-ধারা নির্মিত হয়েছে তা বিগত সময়েরই ধারাবাহিকতার ফসল। পূর্ববাংলার পুরোনো লেখক মাহবুব-উল আলম, আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল ফজল। প্রধান কথাকার শওকত ওসমান, আবু রুশদ, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, সত্যেন সেন। এছাড়াও আছেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, সরদার জয়েনউদ্দিন, আবু ইসাক, আলাউদ্দিন-আল আজাদ, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ।

মাহবুব-উল আলমের মোট চারটি গল্পগ্রন্থ–'মফিজন' (১৯৪৬), 'তাজিয়া' (১৯৪৬), 'পঞ্চঅন্ন' (১৯৫৩), 'গাঁয়ের মায়া' (১৯৫৫)। তাঁর গল্পগুলো জৈবিকতা ও মনস্তত্ত্ব, বাৎসল্য রস, অতিপ্রাকৃত ভাবকল্পনা ও মানব অনুভূতির বৈচিত্র্য সরস উপাদানে ভরপুর। আবুল ফজলের গল্পগ্রন্থ–'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০), 'আয়ষা' (১৯৫১), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) ও 'সপ্তপর্ণী'

[২১] সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, ২০০৪।
[২২] সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, ২০০৪।
[২৩] প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩২৮ বঙ্গাব্দ (মার্চ ১৯২২)।
[২৪] প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারি ১৯২৫)।
[২৫] প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (অক্টোবর ১৯৩১)।

(১৯৬৪)। তাঁর যে গল্পগুলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে সেগুলো হচ্ছে 'রহস্যময়ী প্রকৃতি', 'মা', 'মাটির পৃথিবী', 'পরদেশিয়া', 'হাকিম', 'দুই রাত্রি', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'বিবর্তন', 'রাহু', 'সাক্ষী' ও 'সিতারা'। 'তাঁর গল্পে আছে জীবনের খণ্ড পরিসরের ছবি যাতে প্রতিফলিত হয়েছে (ক) বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি, (খ) আঞ্চলিক পরিবেশের একটি স্বচ্ছ রূপ, (গ) সামাজিক অসাম্যজনিত দুর্ধশা ও দারিদ্র্য, (ঘ) কৌতুকপ্রিয়তা, (ঙ) অন্ধ ধর্ম সংস্কার থেকে মুক্তির উদ্‌বোধন।'[২৬] হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' ও 'মানুষের মন' উল্লেখযোগ্য। শওকত ওসমানের আটটি গল্পগ্রন্থ–'পিঁজরাপোল' (১৯৫০), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১), 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫২), 'উপলক্ষ্য' (১৯৬২), 'প্রস্তর ফলক' (১৯৬৪), 'নেত্রপথ' (১৯৬৮), 'উভশৃঙ্গ' (১৯৬৯), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৭৪)। আবু রুশদের চারটি গল্পগ্রন্থ–'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৯), 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮), 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' (১৯৬৩), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৭৯)। আবু রুশদ মুসলিম মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়, যেমন–মনোবীক্ষণ, জীবনের অন্তিম মুহূর্তের উপলব্ধি, সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক চেতনার সংঘর্ষ, মুসলিম দাম্পত্য জীবনের জটিলতা, দেহজ অনুভূতির বৈচিত্র্য বিকাশ, বাৎসল্যরস, বয়সন্ধিকালে দ্বন্দ্ব ও চেতনা ইত্যাদি। আলাউদ্দিন-আল আজাদের সাতটি গল্পগ্রন্থ–'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫২), 'মৃগনাভি' (১৯৫৪), 'উজান তরঙ্গে' (১৯৬২), 'যখন সৈকত' (১৯৬৮) ও 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৫)। তিনি সংগ্রামমুখর জীবনকেই অবলম্বন করেছেন।

প্রবাসে বাস করে বাংলায় ছোটগল্প যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরাও মূলধারার বাংলাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেছেন। প্রবাসে বসে ও জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে যে তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক ছোটগল্প রচনা করেছিলেন–সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) ও আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬)–তাঁদের কথাই ধরা যাক। এই তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক জন্মসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হলেও তাঁরা তিন-সময়ের পৃথক পৃথক বাংলা ডায়াস্পোরা ছোটগল্পের সৃষ্টিকর্তা, তথাপি বর্তমান প্রবাসপ্রহরেও তিনজনই সম্মানে লালিত হওয়ার যোগ্য, আর তাঁদের রচনাবোধ, বিষয় নির্বাচন, ভাষারীতি ও প্রতীক ব্যবহার এই প্রমাণ করে তাঁরা ও তাঁদের সৃষ্টিকর্ম–ছোটগল্পকার ও ছোটগল্প–উজ্জ্বল ধারাবাহিকতায় পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ধরা দেয় সচেতন পাঠকের কাছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে খালেদা হানুম বলেছেন, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে কারো সমগোত্রীয় রাখিনি। কেননা তিনি অনন্যতার দাবি রাখেন। নৈর্ব্যক্তিক মননশীল জগতে তাঁর পদচারণা। তিনি নিরীক্ষাবাদী জীবনশিল্পী।'[২৭] তাঁর দুটো গল্পগ্রন্থ–'নয়নচারা' (১৯৪৫), 'দুই তীর' (১৯৬৪)। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'গল্প সমগ্র' নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে, এতে উভয় গ্রন্থের সতেরটি গল্পসহ তিরিশের বেশি গল্প সংকলিত হয়। শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে ড. রফিকউল্লাহ খান বলেছেন, 'শামসুদ্দিন আবুল কালাম ছিলেন মূলত রোম্যান্টিক জীবনশিল্পী। দারিদ্র-পীড়িত, উন্মুলিত-অস্তিত্ব মানব-মানবীর জীবনের সঙ্কট ও সংগ্রাম রূপায়ণে কঠোর-কঠিন বাস্তবতার পরিবর্তে তিনি দুঃখ, বেদনা ও রক্তক্ষরণকে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন।'[২৮] আবদুর রউফ চৌধুরী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) বা শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)-এর যে-যুক্ততা ছিল ঢাকার সঙ্গে, তা তাঁর [আবদুর রউফ চৌধুরীর] ছিল না।'[২৯] তবে 'চল্লিশের দশকে আমাদের গল্পে-উপন্যাসে যে-আধুনিকতা শুরু হয়, আবদুর রউফ চৌধুরী তারই উত্তরসাধক। পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্যিকদের–আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়ান, রাবেয়া খাতুন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আহমদ মীর, হুমায়ুন কাদির, মুর্তজা বশীর প্রমুখ–সমসাময়িক হিশেবে তাঁকে [আব্দুর রউফ চৌধুরীকে] বিচার করা যায়।'[৩০] এই তিনজন প্রয়াত বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিকের কথা উল্লেখ করা হল এজন্যই যে, তাঁদের সৃষ্টিনিদর্শনে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈসর্গিক মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। তাঁরা বাংলা ভাষার ছোটগল্পের পরম্পরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেন্দ্রীয় ধারা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। তাঁরা বিশেষ কোনও মতাদর্শ বা মতবাদের অনুসারী নন বরং তাঁরা চিরায়ত মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

২.

আবদুর রউফ চৌধুরী একজন দ্রোহী কথাসাহিত্যিক। একদিকে যেমন তিনি শিল্পী অন্যদিকে তেমনি প্রতিবাদী। মন্ময় সাধনায় যেমন তাঁর কৃতিত্ব আছে তেমনি তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতেও সিদ্ধহস্ত। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার ছিল তাঁর সামনে উন্মুক্ত। তাঁর ছোটগল্পে আছে শৈলীর অবাধ প্রয়োগ; কারণ তাঁর মন ছিল এক প্রগাঢ় রূপশিল্পীর মন। তাঁর ছোটগল্পে শুধু দৃশ্য-রূপই নয়, উপলব্ধি ও মননের নব-রূপ যেন অবয়ব পরিগ্রহণ করে। ব্যক্তির স্বার্থপরতা বা সুবিধাবাদেরও একটি শিল্পরূপোজ্জ্বল চেহারা তাঁর ছোটগল্প থেকে অনুভূত হয়, যা সবসময়ে জীবন নৈতিকতা-নির্ধারিত পথে চলে না; তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তিনি সাহিত্যের

[২৬] খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-১৯৭০), ১৯৯৭।
[২৭] খালেদা হানুম, বাংলাদেশের ছোটগল্প (১৯৪৭-১৯৭০), ১৯৯৭।
[২৮] ড. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭।
[২৯] আবদুল মান্নান সৈয়দ (ভূমিকা-সম্পা.), নতুন দিগন্ত সমগ্র, ২০০৫।
[৩০] আবদুল মান্নান সৈয়দ (ভূমিকা-সম্পা.), নতুন দিগন্ত সমগ্র, ২০০৫।

মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে এক দ্রোহী মানসিকতাকে অবলম্বন করে তাঁর শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর চেতনা কোনও কোনও সময় অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত হলেও তাঁকে জীবনবিমুখ করেনি, বরং তাঁর শিল্পে বৈভব বর্ধিত হয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই দীর্ঘ। তিনি ছোটগল্প রচনায় প্রথাসিদ্ধ নিয়মকেই অনুসরণ করেছেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারারই তিনি উত্তরসাধক; তবে বৈচিত্র্যগুণে ও নিজস্ব রূপদৃষ্টির নির্মাণ-কুশলতায় তাঁর ছোটগল্প অন্যরকম। সচেতনভাবে তিনি কোনও গোষ্ঠীর মতবাদ বা তত্ত্ব তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রে-ঘটনায়-সংস্থাপনে আরোপ করতে না-চাইলেও তাঁর যুগের যুবমানসের মনোবিশ্লেষণের ভাবটি কোনও কোনও গল্পের বিষয়ধর্মে কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে; তবে এই ভাবের প্রবাহ এসেছে ছোটগল্পের প্রয়োজনে, চরিত্রের অনিবার্য কারণে।

আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পের বর্গীকরণ করলে তাঁর গল্পগুলোর একটি সুষ্ঠু কাঠামো পাওয়া যাবে এবং মূল্যায়নেও সহায়ক হবে।

ক. দাম্পত্য জীবনের জটিলতা: নীলা, আত্মব্রত, বিকল্প, বন্ধুপত্নী।
খ. সামাজিক সমস্যা ও প্রতিবাদ: জিন, নেশা, ভূত ছাড়ানো, জিনা।
গ. মনস্তাত্ত্বিক: রানী, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরিচয়, শাদি।
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: অপেক্ষা, পিতা, বীরাঙ্গনা, বাহাদুর বাঙালি।
ঙ. বাৎসল্য রস: উপোসী, স্নান, যৌতুক, ট্যাকরা-ট্যুকরি।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের এই বিভাজন অবশ্য পাথর খণ্ডের মতো স্থির কিছুই নয়; এক বিভাগের গল্পের সঙ্গে অন্য-বিভাগের লক্ষণও এসে জুড়ে যায়, তবুও আলোচনার সুবিধার্থে এরকম একটি শ্রেণীকরণকে সহায়ক সারণী রূপে গ্রহণ করা যায়।

**ক. দাম্পত্য জীবনের জটিলতা**

'প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকের অন্তরালে একটি বক্তব্য আত্মগোপন করে থাকে। গভীর জীবনবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক এই বক্তব্যকে পাঠকের প্রত্যক্ষ গোচরে আনতে চান না। সেই বিশেষ কথনটি আঙ্গিক বা ভাববস্তুতে এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে শিল্পরসটি ক্ষুণ্ন না হয়।'[৩১] সমাজের সমস্যা ভারাক্রান্ত অবস্থা আবদুর রউফ চৌধুরীর বিবেকী সত্তাকে আলোড়িত করেছে, আর এই প্রতিক্রিয়ার সফল শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে তাঁর 'নীলা', 'আত্মব্রত', 'বিকল্প', 'বন্ধুপত্নী' প্রভৃতি গল্পের আবহে। মানুষের জীবনে প্রতিদিন নানা ঘটনা ঘটে। সংসারের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয়। জীবনকে মোহগ্রস্তভাবে নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী; ভেবেছেন মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা। ক্ষয়, শীর্ণতা, গ্লানি, চরম বৈষম্য থেকেই জন্ম নেয় মহৎ সত্য–জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। এরই সন্ধান মিলে তাঁর ছোটগল্পে, যার আবেদন পাঠকের চিত্তে মহৎ সত্যকে জেনে নেওয়ার একটি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে, আকর্ষণ তো বটেই। 'নীলা', 'আত্মব্রত', 'বিকল্প', 'বন্ধুপত্নী' গল্পগুলোতে দাম্পত্য-জীবনের জঠিলতা এসেছে, এসেছে প্রীতিতে, স্নেহে, কল্যাণ-কামনায় এবং অকথিত পারস্পরিক আকর্ষণে ভালোবাসার সম্পর্কও; অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদের সুনিশ্চিত আভাস থাকলেও আরও কিছু কথা যেন থেকে যায়, সবই নিঃশেষে সমাপ্ত হয় না। এসব গল্পে কামনা, প্রেম, ঈর্ষা-বিরাগজড়িত জীবন বর্ণনাংশের বিন্যাস-কুশলতায় সত্য হয়ে উঠেছে মহাসত্য।

<u>নীলা</u>

একজন বিবাহিত নারীর প্রতি তার স্বামীর অকথিত অবহেলা এ-গল্পে চমৎকারভাবে, সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে:

> নীলার ভিতরে অনেক বিক্ষোভ অভিমান আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে যেন কোনও দিনই কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি; তার স্বামীর কাছ থেকেও না, না পেয়েছিল, ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বামী কী কোনও দিন তার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তার মনে পড়ছে না, হয়তো সারা জীবন সে-ই তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। মেঘ ও জ্যোৎস্নার খেলার মতো, বোবার কথা বলার ইচ্ছের মতো সে তাদের দাম্পত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো হৃদয়ে সযত্নে ধরে রেখেছে।[৩২]

স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর অন্যত্র চলে যাওয়াটা যে, একজন স্বামীর চিত্তের হতাশা তা আবদুর রউফ চৌধুরী নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন, এবং তিনি এই ব্যথাতুর চিত্তের হাহাকার পাঠকের অন্তরে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। 'নীলা' গল্পে যেমন করা হয়েছে:

[৩১] আবুল ফজল, ১৯৭৪।
[৩২] নীলা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

> নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কীই-বা করার ছিল তার! কখনও কখনও ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্কের ফাঁক পূরণের জন্য বন্ধুজনের শরণাপন্ন হতেন, কিন্তু তাদের অশোভন উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের মন ও আত্মাকে আত্মশক্তি দিয়ে শাসন করতেন।

গল্পরস ঘনীভূত করার জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হয় তা আবদুর রউফ চৌধুরীর অজানা নয়। 'নীলা' গল্পে যেমন করা হয়েছে:

> নীলা অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ করছে। তার যন্ত্রণাময় জীবন যেন এক কাঁটাওয়ালা বিষাক্ত ফুল, পৃথিবীর পরিত্যক্ত বস্তু। গভীর অরণ্যে, কাঁটাঝোপে যেন তার বসতি। নীলার জীবনের সীমানা তার কাছে অজানা থাকলেও সে কারো কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে পারে না, এমনকি তার বুকে স্বামীবিহীন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হাপর মারলেও না; বেদনার ঝাপটে হৃদয় ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেলেও না; নিশিথে যদিও সে তার স্বামীর সঙ্গে যৌনস্পৃহার সময়গুলো উপলব্ধি করে সর্বাঙ্গময় তবুও না। এসব কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীলা, তাই হয়তো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মদচ্ছির আলীর দিকে। তার দৃষ্টি করুণ। এই করুণ দৃষ্টির কারণেই মদচ্ছির আলীর অন্তরের ঠিক মাঝখানে, অদ্ভুত চাপাপড়া একটি পাথর ভেদ করে, মুখে বলা যায় না এমন এক যন্ত্রণা আঁচড় কাটতে লাগল।[৩৩]

আবদুর রউফ চৌধুরী এ-গল্পের বিষয়ের মূলভাব উদঘাটনে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা যথাযথ হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাসে সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা বর্জিত। এর বর্ণনায় স্বাভাবশিল্পী আবদুর রউফ চৌধুরীর জীবনদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে, যার সঙ্গে রয়েছে সহজ-বাস্তব সাধারণ জীবনচর্যার একটি নিবিড় সম্পর্ক।

আত্মব্রত

আবদুর রউফ চৌধুরীর এ-গল্পে শিল্প-দৃষ্টির প্রধান শক্তি মধ্যবিত্ত সমাজকে জানা ও চেনার রঞ্জন-রশ্মি প্রকাশ করা। এখানে তাঁর অতলস্পর্শী দৃষ্টির স্বচ্ছতা বিস্ময়কর। সত্যিকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাফল্যে তিনি চিত্রিত করতে পেরেছেন। হাজী মজনুর যৌনতৃষ্ণা অপরিসীম ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধারণাটি হচ্ছে, নারীর এক-পুরুষগামিতা আর পুরুষের বহু-নারীগমন সম্পর্কিত বিধি। সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও হাজী মজনু তার প্রথম স্ত্রীকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য দায়ী করে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

> তবে রেখা জানে, সে মার্জিত ও অহঙ্কারী একজন নারী; তার সুরূপ ও অহঙ্কার হাজী মজনুর দিকে তাকে ফিরতে দেয়নি। [...] ছোট্ট-বড়ো বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে প্রণয়ডোর যখন স্বাধীনতা নামক স্বাদটিকে বর্ধিত করে তখন শৃঙ্খলতায় আঘাত তো আসবেই; আর প্রণয়ডোর যখন ছিঁড়ে যায় তখন উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব সহজেই সৃষ্টি হয়। এই স্বাধীনতার স্বাদকে তরান্বিত করতে রেখা হয়ে উঠল খরস্রোতা।[৩৪]

আজকের পৃথিবীর বহু সামাজিক অশান্তির মূলে কিন্তু এই স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষাই দায়ী। এই আধুনিক কালের স্বাধীনতায় কেউ কারো সম্পত্তি নয়, কেউ কারো অধীন নয়–একথাই প্রকাশ করেছেন লেখক। সোজা কথায় পুরুষ নারীকে নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখতে চায় নিজের স্বার্থে–এরই প্রতিবাদ করেছেন গল্পকার।

> কাউকে পরিপূর্ণ রূপে পেতে হলে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় অন্তরের সব জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিয়ে। তাকে উদাত্তভাবে আহ্বান করতে হয় একক অভিলাষে।[৩৫]

নারী প্রেম চায়, ঘর চায় এবং পুরুষকে জয় করতে চায়–এই তিনটি রূপেই আবদুর রউফ চৌধুরীর নারী-চরিত্রটি দেখা দিয়েছে তাঁর এই গল্পে।

> এক সন্ধ্যায়, সন্তান-দুটো নিয়ে রেখা এক নবীন এঞ্জিনের সাহায্যে ও যুবক-পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গেল; নতুন প্রেম লাভের, ঘর বাঁধার এবং পুরুষচিত্ত জয় করার আশায়।[৩৬]

বিকল্প

এই গল্পের নামই এর উদ্দেশ্যকে ধারণ করে এবং পাঠককে ধারণা দেয় গল্পের গতিপথ সম্বন্ধে।

> 'বিকল্প' গল্পে মাফিক ও জায়েদার বিবাহিত জীবনে মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মাফিকের শ্বশুর। অর্ধগৃধ্নু শ্বশুর জামাই-এর কাছ থেকে মোহরানার অংশ হিসেবে অলংকার আদায় না করে কন্যাকে তার স্বামীর সঙ্গে যেতে দেবে না, তার পক্ষে ওকালতি করতে আসে ধর্মব্যাবসায়ী মৌলা, প্রয়োজনে তারা মাফিকের কাছ থেকে তালাক নিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মাফিকের তরুণ বন্ধু বাহার ও আবদ-আল-মাওলা তাদের পরিকল্পনার বিপক্ষে

[৩৩] নীলা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৩৪] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৩৫] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৩৬] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

জোরাল অবস্থান নেয়। শেষ পর্যন্ত ভোরের আলো-ছায়ায় সকলের অগোচরে নতুন জীবনের প্রত্যাশায় মাফিক ও জায়েদা যাত্রা করে। গল্পটির সমাপ্তি গভীর ইঙ্গিতবহ। কুসংস্কারে অবদ্ধ জীবন থেকে উদারনৈতিক জীবনের উদ্বোধনের ইঙ্গিত প্রদান এবং পুরাতন ও নতুন জীবনের সংঘাত ও নতুনের বিজয়কে অর্থবহভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।'[৩৭]

'আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন সনাতনী সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তরুণ-তরুণীদের হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে বাধা কখনও কখনও এমন অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে যে তরুণ-তরুণীদের নানা ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে পৌঁছে দেয়। জায়েদা, মাফিক এক্ষেত্রে সাহসী, খুঁজে নিয়েছে বিকল্প পথ। লেখক আবদুর রউফ চৌধুরী বলার ভঙ্গিতে বিকল্প এ-পথ খুঁজে নেওয়াকে অভিবাদন জানিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন আধুনিকতম মননের।'[৩৮]

বন্ধুপত্নী

'বন্ধুপত্নী' মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। নারী হৃদয়ের যাতনা ও পুরুষ মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে গল্পটি মূল্যবান।[৩৯]

স্বামী-বন্ধুর গোঁয়ার্তুমি নাসরিনের অন্তর্দাহের মূল কারণ। যেদিন থেকে নাসরিন তার স্বামীর সঙ্গে করাচিতে বসবাস শুরু করে সেদিন থেকেই তার স্বামী-বন্ধুর আনাগোনা বেড়ে যায়। স্বামীর নির্দেশে তার বন্ধুর আদরযত্ন করতে শুরু করে নাসরিন। প্রথম প্রথম সে আসত তার স্বামীর সঙ্গেই, পরে একা একা। নাসরিনকে একা পেয়েই সে ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কথা বলে। একদিন সে এসে শাসিয়ে যায়, তার কুমতলবে যদি নাসরিন রাজি না হয় তাহলে সে তার স্বামীকে বাধ্য করবে তাকে তালাক দিতে। তারপর স্বামীর আরেক বন্ধুর পরামর্শে নাসরিনের মানসিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

### খ. সামাজিক সমস্যা ও প্রতিবাদী গল্পসমূহ

কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কাছে বিচারবুদ্ধি সমর্পণ করলে মানুষের পরিণাম ঘটে অনিবার্যভাবে অপমানে। সেই অপমান দেখা দিয়েছে 'জিন', 'নেশা', 'ভূত ছাড়ানো', 'জিনা' প্রভৃতি গল্পে।

জিন

অবয়ববাদী সমালোচকরা গল্পজাতীয় রচনায় 'বয়ন' ও 'গল্প' এই দুটো বিষয়ে যে একরকম ভাগ করে থাকেন, সে বিভাজনে আবদুর রউফ চৌধুরীর মতো গল্পকাররা সঙ্কট তৈরি করেন। তাঁর মতো লেখকরা মনে করেন যে, বয়ন ছাড়া যেমন গল্প হয় না তেমনি গল্পকে সরিয়ে নিলে বয়নের ভিত্তি থাকে না, তাই তাঁর মতো লেখকরা বিশেষ যত্নে কাহিনীকে মূল ভিত্তি করে ভাষা ও কারুকাজে গল্প-নির্মাণের কাজটি ফুটিয়ে তুলেন। সমগ্র গঠন এবং ক্ষুদ্রতম অংশ–দুটোই তখন চিহ্নিত পরিচর্যা হিশেবে প্রকাশিত হয়। আবদুর রউফ চৌধুরীর এই গল্পে এর প্রমাণ মিলে, যা প্রকাশ করতে তিনি গ্রামেই আশ্রয় নিয়েছেন। এই গল্পে গ্রামের মানুষ সমন্ধে তাঁর মমতা ও বেদনার পরিচয় ব্যাপক। গ্রামের মানুষের জীবনের উল্লাস ও বেদনা, সুখ ও কেদ, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ছবি যেমনি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাদের মুখের ভাষা তাঁর কলমের আঘাতে এক অসাধারণ বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠেছে, যা মানবিক সহানুভূতির পরিচয়-প্রকাশই বটে। এ-গল্পে লেখকের দেখার দৃষ্টি মনে হয় দূর থেকে নয়, বরং একেবারে কাছ থেকে দেখা। এ-গল্পের চরিত্রগুলোর ভাবনা ও বেদনাকে ঘিরে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও গ্রামের মানুষের জীবন-আচরণ ও পরিবেশের তথ্যনিষ্ঠ ও জীবন্ত বিশ্বস্ত চিত্রই ফুটে উঠেছে। পরিবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক :

১. [...] গোপাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ কলাগাছটি নীরবে আঁকড়ে রয়েছে মাটি ও পানি।[৪০]
২. চাঁদ উঁকি দিল আবার, সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে নিয়ে বাঁশবনের ফাঁকে কচুরিপানাগুলো লুকোচুরি খেলতে শুরু করল [...]।[৪১]
৩. ঘর নিঝুম, আকাশ নিঝুম, বাঁশপাতা নিঝুম, তবে বাঁশবনে ব্যাঙের দল সুর তুলেছে আবার, ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর; ডুবাজলে মাছের লাফালাফি চলছে সফাৎ সফাৎ [...]।[৪২]
৪. পুকুরের পাড় ডুবুডুবু করে পৃথিবী শান্ত হল, পাড়ার ছাগলপাল কান্না থামাল [...]।[৪৩]
৫. [...] সিদ্দিক আলীর দাওয়ার চাল উড়ে গিয়েছে, হা-হা করছে, যদিও ছনের কোনও দোষ ছিল না, দিন কয়েক আগেও সে শক্তহাতে মেরামত করেছিল, বেঁধেছিল ঝাউবেত দিয়ে, তার ওপর ছেঁড়া মাছধরার জালটিও ছড়িয়ে দিয়েছিল।[৪৪]

[৩৭] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।
[৩৮] রুমা মোদক, চৌধুরীর 'গল্পসম্ভার' সচেতনতা, দায়বদ্ধতা এবং শিল্পমান, ১৯৯৭।
[৩৯] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।
[৪০] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪১] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪২] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪৩] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪৪] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

গল্পটি মনস্তত্ত্ব প্রধান, জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে আমেনা নিজের অন্তরকে শূন্যতায় বিষণ্ন করে রাখে। সিদ্দিক আলী মমতা ও স্নেহ দিয়ে আমেনাকে আরোগ্য করে তুললেও পীরের অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান করতে পারেনি, বরং পীর যখন 'বিদায় নিতে উদ্যত' হন তখন 'গায়ের রক্ত পানি-করা' অনেক দিনের প্রচেষ্টায় যে ক'টি টাকা জমিয়েছিল, তা সে নিঃশব্দে মোল্লাজির হাতে তুলে দেয়।

'জিন'-গল্পে আবদুর রউফ চৌধুরী রূপ-কলা-কৌশল গভীর মানসিকতায় সমৃদ্ধ করে গল্পনির্মাণের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন; তিনি গল্পের নির্মাণকলা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি ভূতকে চিহ্নিত করে পরম যত্নে মানুষের ব্যবহার ও অপব্যবহারে গল্পটির আখ্যান রচিত হয়েছে। ভূতে-ধরা এবং পরে আবার ভুতে-ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে মানুষের গল্প থেকে একটু সময়ের জন্য নজর সরিয়ে আবার মানুষের আরও গভীরতর গল্পে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন–এতে বাংলার অবহেলিত নারীজাতির সবচেয়ে দুঃখের বা অপমানজনিত ইতিবৃত্তিটি গ্রথিত হয়েছে। গল্পের রূপ-কলা-কৌশল যেমন শক্তিশালী তেমনি কাহিনীও। উপসংহারে একটি ঘটনা অতিক্রম করে আরেকটি ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনার সন্ধান পাওয়া যায়। আমেনার প্রত্যাশাপূর্ণ প্রশ্ন–'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?' এখানেই যেন মূল গল্পটি শুরু হয়। স্ত্রীর মুখে কী সিদ্দিক আলী সন্ধান করে তার নিজস্ব জীবনভূগোল, তার এতদিনের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সূত্র, তার বন্ধন–এসবই ভাবতেই থাকি। ভাবতে থাকি এ-গল্পের রস মোপাসাঁ বা ও'হেনরির রচনার চমক সম্বন্ধে, যা অলক্ষিতই থেকে যায়। আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের বিষয়ে যেমন মানুষের আত্মার টান আছে ঠিক তেমনি নির্মাণকলাও বিস্ময়কর ও স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

নেশা

মানুষের জীবনের মৌল রূপটি যতই আদিম হোক, কী তার আসল রূপ–এই ভাবনা থেকেই রচিত হয়েছে 'নেশা' গল্পটি। এ-গল্পের কাহিনী হচ্ছে এরকম: জাবেদ নামের এক প্রবাসী বাঙালির এক-রাত ও এক-সকালের ঘটে-যাওয়া ইতিবৃত্ত। তার সূত্র ধরে গল্পকার চরিত্র ছাড়িয়ে মানব স্বভাবের আদিমতম বৃত্তি–যৌনতা, ধার্মিকের নির্দয়তা, বিদেশির ক্রুরতা, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের সমন্বয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াসগুলো অতি নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। শত বাধা-প্রতিকূলতার মধ্যেও জাবেদ পরাজয় মেনে নেয় না, সর্বদাই সে যেন অপ্রতিহত ও অনবদমিত। সবকিছুর মধ্যে জীবন উপভোগের এক প্রবল বাসনা তার ভেতর সক্রিয় থাকে। এই গল্পের প্রথম ঘটনাস্থলরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে ব্রিকলেন, পরে অক্সফোর্ড স্ট্রিট; আর শেষ হয়েছে আবার প্রথম ঘটনাস্থলে। নারীর সঙ্গবিহীন এক নিরুৎসাহ জীবনের জ্বলন্ত ছবি লেখক এঁকেছেন কাহিনী-বিন্যাসে ও বর্ণনার রঙে-রসে। তিনি জাবেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে উপকাহিনীর সাহায্য নিয়েছেন। বর্ণনার বাস্তবগুণ, বাস্তবতার অভ্যন্তরে প্রবাহিত লেখকের স্মৃতি, বৃহত্তর সামাজিক ও গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিত–সবই যেন প্রকাশিত হয়েছে এ-গল্পে।

বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে চলিতগদ্য, লেগেছে কাব্যের স্পর্শ। বর্ণনার মাধ্যমেই অনেকটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেয়েছে নারীর সঙ্গবিহীন পুরুষের জীবনের চিত্রটি। এতে গল্পের রসহানি হয়নি বরং গল্পের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, কাঠামোতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে গড়া জীবনের পরিপূর্ণ ছবি অনাবিষ্কৃত থেকে যায় যদি না এতে থাকে মানুষের গোপন ইচ্ছার প্রকাশ। দেহের বাসনাকে অস্বীকার করলে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখানো অসম্ভব। দ্রোহীশিল্পী এ-থেকেই উপকরণ খুঁজে নেন, খণ্ড পরিসরে সৃষ্টি করেন মানুষের পূর্ণাবয়ব চিত্রটি। এই গল্পের গঠনে লেখক প্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ণনার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন সংলাপ, যার ভাষা স্বতন্ত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাব একেবারে গল্পের শেষতম অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে :

> জাবেদ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'গতরাতে কি হয়েছিল? কোনও গোলমাল করেনি তো?' হেসে উঠল অভিষেক, তারপর বলল, 'না।' জাবেদকে দেখতে দেখতে সে মনে মনে বলল, গতরাতের যে-বিরক্তি, যে-তিক্ততা আমার ভেতর নাড়া দিচ্ছিল–সবকিছুই যেন বিলাতি তুষারের মতো হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে।[৪৫]

পাঠক রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি শেষ করবেন কিন্তু পাঠ শেষে তার অন্তরে অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম নিবে; এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। বাংলাদেশের ছোটগল্পে এরকম গভীর ভাবদ্যোতক প্রেরণা বিরল।

ভূত ছাড়ানো

> 'ভূত ছাড়ানো' গল্পে লেখক বাঙালি জীবনে বহুদিন থেকে চলে আসা একটি বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করেছেন। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস বাঙালির আবহমান কাল থেকে। মদরিছের স্ত্রীর ভূত ছাড়াতে আসা অর্থলোভী কামুক পীর এবং সে ভূত ছাড়িয়ে অর্থ নিয়ে যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত জানা যায় আসলে মদরিছ তার স্ত্রীকে 'নাইওর' যেতে দেয়নি তাই সে ভান করেছিল। এই গল্পের মধ্য-দিয়ে গ্রাম্য কুসংস্কারের কারণে সরলপ্রাণ মানুষগুলো কীভাবে প্রতারিত হচ্ছে তারই বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার।[৪৬]

জিনা

[৪৫] নেশা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪৬] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।

নীলার জীবনের সঙ্কট অবলম্বন করে নারী ও পুরুষের মিলনে সৃষ্ট জিনা-নামক সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করে সুযোগসন্ধানী তৎপরতার উপর আলোকপাত করেছেন গল্পকার। এই গল্পে একদিকে তিনি একটি নারীর চিন্তাচেতনাকে যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তেমনি গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন নারীর মর্যাদা কীভাবে অতি উৎসাহী ধর্মরক্ষকদের হাতে পর্যদস্ত হয়। এ-গল্পে তাত্ত্বিক কথাবার্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

**গ. মনস্তাত্ত্বিক**

মানুষের মনের লীলা-বৈচিত্র্যকে প্রধান্য দিতেই হয়তো আবদুর রউফ চৌধুরী 'রানী', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'পরিচয়', 'শাদি' প্রভৃতি গল্প সৃষ্টি করেছেন। পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করতে, বিক্ষুব্ধ করতে এসব গল্পের বিষয়বস্তু হয়তো নির্বাচন করেছেন তিনি। তাঁর তুলিতে উদয় হয়েছে অনুভূতির বিচিত্র প্রতিক্রিয়া, এ যেন প্রদীপের আলোর মতোই ক্ষণস্থায়ী, যা পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে, পাঠক-হৃদয়ে কল্লোল জাগায়। আবদুর রউফ চৌধুরী যা সৃষ্টি করেছেন তার মূল সুর গভীর তত্ত্বের নয়, সাধারণ মানুষের মনের পাতায় যে দু-চারটি সূক্ষ্ম অনুভূতির রেখা ফুটে ওঠে তাই যেন।

রানী

'রানী' গল্পের ভাবসম্পদে 'রেলস্টেশন' প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করে হৃদয় আবিষ্কারের প্রয়াসকে ব্যক্ত করা হয়েছে। রানীর হৃদয়ের বিকাশ লক্ষ্য করার মতো। এই বিকাশ সাধনে লেখক যে স্বাভাবিক গতি দান করেছেন এতে গল্পটি রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর পটভূমি করাচির সেনানিবাস। এই সেনানিবাসের মানুষগুলোর প্রকৃত রূপ চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না, এর দর্শনের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি। সাধারণ দর্পনে প্রতিবিম্বত হয় যে চেহারা সেটা মানুষের অন্তরলোকের নয়, ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক থেকে যা উন্মুচিত হয় সেটাই সঠিক চিত্র। মোটামুটি এই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন গল্পকার। স্বামীর চরম অবহেলায় রানীর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা লেখক দেখিয়েছেন, তিনি জানেন, নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়ে গেলেও গল্পে সৃষ্টি করতে হয় নতুন আলোর ঝর্ণাধারা, যা জীবনমুখী ও মহৎ আবেদনমুখী। আফসারের বন্ধু কায়সারকে কেন্দ্র করেই এ-কাহিনীর সূত্রপাত।

> কায়সারের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল, এই সম্পর্ক সে প্রাণপণ অস্বীকার করতে চায়, ঠেলে দিতে চায় মাথা থেকে, তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'না মানলে কি করবে?' কায়সার সম্পর্কটিকে না-মানলে রানীর মনের অব্যক্ত কথাগুলো উচ্ছ্বসিত জলাশয়ের মতো ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে হৃৎপিণ্ডের গভীরে হারিয়ে যাবে; যেখানে বনমোরগের ডাক চলছে–অনিয়মিত, বর্ণশূন্য, রুক্ষ; ঘরের বাতাসের মতো অনিশ্চিত; অনিশ্চিত ঘাসহীন, কাদাহীন রোদভেজা মরুবালুর মতো, অনিশ্চিত সিন্ধুনদের উপর বয়ে চলা লবণাক্ত লু-হাওয়ার মতো–কখনও হিম, কখনও শীতল, কখনও বরফঠাণ্ডা, আবার কখনও রঙচটা নিস্প্রাণ বস্তুর মতো ফ্যাকাশে। কায়সার জানে, অব্যক্ত হৃদয়ের কথাগুলো কঠিন জটলায় ডুবে গেলে সেখানে জন্ম নেবে লাল-নীল রক্তের জটিল মোহনা, আস্তেধীরে ক্ষতস্থানটি শুকিয়ে উঠলেও বিবর্ণ মরা হৃদয়ের অব্যক্ত কথাগুলো বঞ্চিত ঘটঘটে হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যাবে, সঙ্গে হৃদয়ের শেষ আকাঙ্ক্ষাটিও; কিন্তু অব্যক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করতে পারলে হৃদয়াঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটি ছেঁড়া কাগজের মতো শুকোবে, জীবনবৃক্ষে সজীবতা লাভ করবে, শরীর প্রেমকামের তৈলাক্ত রসে ঋজু হবে।[৪৭]

ঘটনার উন্মোচনে রয়েছে নাটকীয়তা, বিকাশে দুর্ধমনীয় সংশয়, উপসংহারে স্বস্তির আবরণে মোড়া অতৃপ্তির রেশ–ফলে ছোটগল্পের সব গুণই এতে প্রকাশিত, বিকশিত। এ-গল্পের নামও যেন রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক এ-গল্পে একটি বাস্তব সমস্যা তুলে ধরায় উদ্দেশ্যমূলকতার সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করে এর আবেদন পাঠকের মর্মমূলে স্পর্শ করেছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

একটি মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্প, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র শরিফসাবের বিচিত্র অনুভূতির শৈল্পিকরূপ লেখক নিপুনতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। হৃৎ-আক্রমণ থেকে শরিফসাবের মনে জন্ম নেয় একরকম অনিশ্চিয়তা।

> স্বল্প সময়ের ভূমিকম্পে যেমনি একটি শহরের চেহারা বদলে যায় তেমনি কয়েক সেকেন্ডের বিশ্বাসে জীবন সম্বন্ধে শরীফসাবের ধারণাগুলো উলটেপালটে গেল।[৪৮]

এই ক্ষণিকের আক্রমণ তার মস্তিষ্ক থেকে অন্তর্হিত হলেও আবির্ভূত হয় নানা উপসর্গের। উপসর্গরূপে দেখা দেয় ধর্মের প্রতি ক্ষোভ ও ধর্মীয় অনুভূতির বিপরীতে বিজ্ঞানের জয়গান।

[৪৭] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৪৮] সৃষ্টিতত্ত্ব, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

> উঠতি বয়সী এক মুছল্লির গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন। সে তার বন্ধুর কাছে শোনেছিল, 'বিজ্ঞানের মতে বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন; তারপর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অণু-পরমাণু, রেপ্লিকেটিং মলিকিউল, জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম; একসময় গঠনহীন প্রোটিন থেকে নিউক্লিয়াস আর কোষঝিল্লি, কৌষিক আর অকৌষিক প্রটিস্টার অসংখ্য প্রজাতি, প্রাথমিক উদ্ভিদ তারপর প্রাথমিক প্রাণী, তারপর প্রাণী-জগতের অগণিত শ্রেণী-বর্ণ-বংশের প্রকার আর প্রজাতি, শেষপর্যন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং শেষত মানুষ। প্রাণের মূলবীজ হচ্ছে ডিএনএ, যার অণু দেখতে মোচড়ে কুণ্ডলিপাকানো মইয়ের মতো, এর ধাপগুলোতেই রয়েছে জৈবসংকেত।' এসব কথা মনে পড়াতেই তার গোঁফের নিচে ফুটে উঠেছে মৃদু নাচন।[৪৯]

বিচিত্র অনুভূতির সমাবেশ শরিফসাবের চিন্তাচেতনাকে জটিল করে তুলে। শারীরিক বিপর্যয় থেকে যে ভীতি নামক উপাদানের জন্ম, জীবনের আপাত তুচ্ছ সমস্যার সম্মুখবর্তী হয়ে সেই ভীতি রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

> গল্প আর জমে উঠল না। গল্পের লেখকও এতে নিরাশ হলেন। ঘটনাটি যদি ঘটে যেত তাহলে তিনি পাঠককে নিয়ে কল্পনার রথে চড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারতেন, স্বর্গের বর্ণনা দিতে তখন অসুবিধা হত না, কিন্তু তা আর পারলেন কই![৫০]

লেখক এ-গল্পে বাংলা সাধুগদ্য ও চলিতগদ্য দুটোই ব্যবহার করেছেন। গল্পে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সচেতন শিল্পীর যে মমত্ব ও নিরাসক্তি-সমন্বিত সঠিক অবস্থান থাকা দরকার তা লেখক আয়ত্ত করেছেন।

<u>পরিচয়</u>

মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। গল্পকার অনেকটা মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এক যুবকের মনস্তত্ত্ব। মূলত সফিকের মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-অস্থিরতা।

> পিতৃপরিচয়ের অভাবে সফিকের আত্মদাহন, মায়ের উপর বর্তমান পিতার পৈশাচিক অত্যাচার এবং পিতৃপরিচয় পাওয়ার পর তার গভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে লেখা 'পরিচয়'। প্রসঙ্গক্রমে মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বর্বরতা, নারী ধর্ষণ এবং ধর্ষণে তাদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করা সন্তানদের প্রসঙ্গ সংযোজিত হওয়ায় গল্পটি ঋদ্ধ হয়েছে।[৫১]

<u>শাদী</u>

> 'শাদী' গল্পে পুরুষের জন্যে একাধিক বিয়ে কখন এবং কেন জায়েজ এবং বিয়ের আগে বর-কনে পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপকারিতা ইত্যাদি বিয়ে বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বোবা-কনের বিয়ের প্রসঙ্গ সংযোজিত হওয়ায় গল্পটি ঋদ্ধ হয়েছে।[৫২]

### ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে কয়েকটি গল্পকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে 'অপেক্ষা' ও 'পিতা', 'বীরাঙ্গনা', 'বাহাদুর বাঙালি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গল্পের প্রেরণার মূলে সন্ধান পাওয়া যায় রাজনীতি সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম।

<u>অপেক্ষা</u>

'অপেক্ষা' ছোটগল্পের প্রেরণার মূলে পাওয়া যায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম। গল্পটি একজন দেশপ্রেমিক কর্মীর দেশের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসার বিমূর্ত প্রকাশ। আবদুর রউফ চৌধুরীর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগ এখানে তীব্রভাবে উপস্থিত; কারণ, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যেও জেগে থাকে সত্যের উদবোধন। এ-গল্পের মৌল চেতনায় রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে বসবাস করা কাপুরুষ ও স্বার্থপর শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সুউচ্চ প্রতিবাদ। গল্পটি রচিত হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্রান্তিলগ্নে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ নিঃসন্দেহে জাতীয় জীবনের বিশেষ মুহূর্ত–জাতির ভাগ্যাকাশে একটি নক্ষত্র উদিত হওয়ার সময়ে প্রবাসীর মনে কোনও দ্বিধা থাকা অসম্ভব। গল্পের ভাবধর্মে এই বিশেষ চিন্তা ব্যবহৃত হয়েছে। এরসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের নিচতলার জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে সাধারণ মানুষের মনে যে জটিল মানসক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে তা। এই সাধারণ মানুষেরই একজন নাসিম, গল্পের নায়ক। নাসিম চরিত্রের আশ্রয়ে এক অন্তর্প্রবাহী প্রতিবাদী চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাসিম চরিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লেখকের ব্যক্তিত্বের ধারক। ব্যক্তিগত জীবনে লেখকের সংযোগ ছিল শ্রমিক-সংগঠনের সঙ্গে; আর তাঁর মতোই গল্পের নায়কের আছে মানবেতর মানুষের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা।

---

[৪৯] সৃষ্টিতত্ত্ব, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫০] সৃষ্টিতত্ত্ব, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫১] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।
[৫২] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।

গল্পকার পাকিস্তান আমলের সামাজিক পটভূমিতে বাংলাদেশে যে নতুন জীবনাদর্শের উন্মোচন ঘটছিল এর অন্তর্গত সমস্যাগুলোকে তত্ত্বগতভাবে নয়, সরেজমিনে বিচরণ করে, তাঁর অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত করে সার্থকভাবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি রহস্যকার নন, রহস্যভেদী। মনন ও অভিজ্ঞতার এমন মিলন বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিরল।

> ফোঁস ফোঁস আওয়াজে প্রতি নিশ্বাসে ধূমোদ্গার করে যে রেলগাড়িটি করাচি অভিমুখে ছুটে চলেছে তারই তৃতীয়শ্রেণীর এক কামরায় বসে থাকা নাসিম আহমেদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, এঞ্জিনের নির্গত ধূম্ররাশি আকাশের নীলের সঙ্গে মিলেমিশে ধূসর বর্ণ ধারণ করে যেন বাজপাখির মতো ডানা মেলে আছে।[৫৩]

নাসিম রেলগাড়িতে করে করাচি যাচ্ছে। গল্পের ভাবসম্পদে 'রেলগাড়ি' প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার ঐকান্তিক প্রতিজ্ঞা। এ-যেন দরিদ্রবর্গের জীবন এবং তাদের বাঁচবার সংগ্রাম, প্রতিরোধ, দেশ-সমাজ-শ্রেণী রক্ষার বিপ্লবী ভাব। নাসিমের রেলগাড়ির যাত্রা এবং তার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় জীবনের সঙ্কটকে বোঝানো হয়েছে। যেমন :

১. সেপাইদ্বয় যদি ইতরপ্রাণী না হত তাহলে মানুষের এত ভিড়ে অসভ্যের মতো সটান শুয়ে থাকত না; [...]।[৫৪]
২. সীমান্তপথে জিনিশ ও মানুষ যাতে বে-আইনিভাবে পারাপার হতে না-পারে সেজন্য প্রহরী মোতায়েন করেছে সরকার; কিন্তু উপরি রুজি ছাড়া তার মতো গরিবের সংসার চলে না।[৫৫]
৩. [...] পরাধীনতার জগদ্দল পাথর যে-কোনও বিদেশির নামে আপনি বহন করেন না কেন, পরাধীনতার তীব্রতা দিনদিন বাড়েই, [...]।[৫৬]
৪. নাসিম বিস্ময়ানন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'[৫৭]

নাসিম তার সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন চায়, তাই তার কল্পনায় থাকে একদিকে অতীত ও বর্তমান জীবনের গ্লানি অন্যদিকে ভবিষ্যতের সজীব প্রাণপ্রাচুর্য ভরা জীবনের স্বপ্ন। সে নতুন রাষ্ট্র গড়ার জন্যই চায় দেশের আমূল পরিবর্তন। নতুন দেশ তৈরি করার কিছু কারণ সে স্পষ্ট করে; যেমন :

> পরীক্ষানিরীক্ষার অজুহাতে ঢাকা-দেহ-ধমনীর রক্ত শাসকগোষ্ঠী শোষণ করে এনে করাচির শিরা-উপশিরায় নবজীবন সঞ্চার করছে। ক্লাইভের খঞ্জর তারা উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়েছে বলেই হয়তো এমন করছে! তারা এর উপযুক্ত জবাব পাবে যদি বাঙালি জাতি একদিন জেগে ওঠে।[৫৮]

একটি নতুন দেশ রচনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় গল্পের সমাপ্তি ঘটে। এখানেই গল্পের আসল আবেদনটি সৃষ্টি হয়েছে। সংগ্রামী অগ্রগতি বা জাগরণকে অবশ্যম্ভাবী করার লক্ষ্যে লেখকের মানবতার আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। এখানেই তিনি তারাশঙ্কর, ননী ভৌমিক, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী বা আজাদ থেকে পৃথক। এই জাগরণ তাঁর মার্কসবাদী চিন্তার ফসল নয়, তবে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক এই তাঁর চেতনার মূল সুর। নাসিম বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, কিন্তু সে লেখকের হাতে আরও বিস্তৃত। গল্পকারের সহজাত দ্রোহী চেতনা এখানে সক্রিয়।

<u>পিতা</u>

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত আর একটি গল্প। নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে যে চেতনা বিরাজ করে সেই সময়ের বিশেষ মুহূর্তগুলো এ-গল্পের প্রাণধর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-গল্পের নায়ক একজন পিতা। তিনি তার প্রিয়তমাকে হারালেও তার একমাত্র সম্বল তার মেয়েকে নিয়ে একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেন। তার প্রিয়তমা না-থাকলেও তার আছে স্বদেশপ্রেম, আছে সন্তান। পিতা বুঝতে পারেন তার জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করাই হচ্ছে এই ক্রান্তিলগ্নে দেশমাতৃকার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করা। কারণ, একজন পিতার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সন্তানের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ স্থাপন করা। প্রত্যেক পিতাই তার জীবনের সমস্ত কিছু উজাড় করে সন্তানকে তার সাধ্যমতো বাঁচিয়ে রাখতে চান। আবদুর রউফ চৌধুরীর এ-গল্পে এ-ধরনের বিষয়ই প্রকাশ পেয়েছে। পিতার অসহায়ত্ব কীভাবে প্রকাশ পায় মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তারই এক অনুপঙ্খ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। এ-গল্পের বিশ্লেষণে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান হয় সেগুলো হচ্ছে :

(ক) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকের সিলেট বিভাগের পল্লী অঞ্চলের একটি স্বচ্ছ ছবি পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

(খ) আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সিলেট বিভাগের মুখের ভাষার ব্যবহার ঘটনাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

---

[৫৩] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫৪] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫৫] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫৬] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫৭] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৫৮] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

(গ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের একটি হিন্দু দারিদ্র্যকিষ্ট পরিবারের সরস অভিব্যক্তির এক রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-রুচি ইত্যাদি। এসব বিষয় অবলম্বন করে আবদুর রউফ চৌধুরী গল্পের রসকে ঘনীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ-গল্পে সন্তানের কাছে দায়গ্রস্থ পিতার বিপন্ন-বিস্ময়কে উন্মোচিত করা হয়েছে কয়েকটি উপমা যোগে, যেমন 'সোনালি ধানের ঝিলিক', 'পূবালী ঠাণ্ডা হাওয়া', 'তেলমাখা ও রঙজ্বলা গামছা', 'কালাচাঁন্দ অঞ্চল এখন শ্মশানঘাট', 'শয়তানের ত্রিশূল' ইত্যাদি। এছাড়াও সন্ধান মিলে:

১. যুদ্ধ কীভাবে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়;
২. যুদ্ধের কারণে কীভাবে একটি কৃষক পরিবার নিঃস্ব হয়, তার মর্মন্তুদ চিত্র;
৩. শারীরিক দুর্বলতা, যুদ্ধের প্রচণ্ড দাবদাহ, স্ত্রীর মৃত্যু, গৃহ-স্বদেশ ত্যাগ–সবকিছুর পরিণতিতে পিতার মন কীভাবে বিদ্রোহ করে; ইত্যাদি।

তবে গল্পের মূল আবেদনটি সৃষ্টি হয়েছে গল্পের শেষাংশে। গল্পের করুণ সুরের মধ্যেও বীররসের ধ্বনি প্রবহমান। পিতার উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়:

> ক্ষোভে, দুঃখে, অন্তঃগ্লানিতে দিশেহারা পিতা দৌড়ে গেল তার পিতৃভিটের দিকে, একইসঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, 'ইতারেই কিতা স্বাধীনতা কয়?' কেঁপে উঠল বাংলার বিষণ্ন বাতাস; প্রকৃতি রোষবিষ্ট, উম্মান্বিত যেন; একচমকে শতাব্দীসুপ্ত ভীতু পিতার শরীরে শক্তি সঞ্চয় হল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল এক নতুন স্পৃহা–সন্তানকে রক্ষা করা যেমনি তারই কর্তব্য ঠিক তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা তার মতো পিতারই দায়িত্ব।[৫৯]

সমাজ-বাস্তবতার শিল্পী হিশেবে আবদুর রউফ চৌধুরীর যে প্রতিভা, তার আভাস পাওয়া যায় এ-গল্পে। যুদ্ধ দূরীকরণের প্রয়াসে লেখক শিল্পীর সততার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এ-গল্পের ঘটনাতে আছে সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি। পরিবেশের বর্ণনাও কাহিনীকে উজ্জ্বল করেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মবিশ্লেষণ। এ-গল্পে ঘটনার ক্রমবিকাশে এমন প্রবহমানতা আছে, যাতে অনিবার্যভাবে এসেছে নাটকীয় সংশয়দ্বন্দ্ব, যা গল্পের আঙ্গিককে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কাহিনী উপস্থাপনার কলাকৌশল, গঠনকৌশল–ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। গল্পটির নামও গভীর অর্থবহ।

<u>বীরাঙ্গনা</u>

> এক সাহসী গ্রাম্য তরুণী তান্বীর অসীম সাহসিকতার আলেখ্য 'বীরাঙ্গনা' গল্প। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে পাক-হানাদার-বাহিনী ও রাজাকারদের পৈশাচিকতার বিপরীতে উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গ-ললনার বীরাঙ্গনা রূপ। গ্রাম্য-বধূ তান্বী যখন পশ্চিমা পিশাচদের হাতে নিহত স্বামীর শব জড়িয়ে আলুথালুবেশে বিলাপ করছে তখন পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদেও নেতা জাবেদেও লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তান্বীর উপর। কামলোলুপ জাবেদ তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে তান্বী তার গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয়। বঙ্গ-ললনার হঠাৎ এই মূর্তিতে হতচকিত জাবেদ ফিরে যায় তার সৈন্যসামন্তসহ। গল্পের বিষয়বস্তু আসলে প্রতীকী। এর মধ্য-দিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা এবং আপামর বাঙালির প্রতিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছে।[৬০]

<u>বাহাদুর বাঙালি</u>

> 'বাহাদুর বাঙালি' গল্পে তীব্র ঘৃণা নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজাকারদের প্রতি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের ভূমিকা এবং এখন তাদের অবস্থান ও ক্রিয়াকর্মের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই গল্পে। সময়ের ব্যবধানে যে তাদের অবস্থান ও বিশ্বাসের সামান্যও ব্যত্যয় ঘটেনি তারই যথার্থ আলেখ্য লেখক উপস্থাপন করেছেন।[৬১]

**ঙ. বাৎসল্য রস**

বাৎসল্য রস বাঙালি চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলা ছোটগল্পের সূত্রপাত থেকেই এই শ্রেণীর গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎসল্য রসের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালি জীবনের অশ্রুসিক্ত করুণ দিকটিও। আবদুর রউফ চৌধুরী এ-ধরনের একাধিক গল্প লিখেছেন; যেমন 'নেশা', 'উপোসী', 'যৌতুক', 'ট্যাকরা-ট্যুকরি' প্রভৃতি গল্প।

[৫৯] পিতা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬০] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।
[৬১] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।

উপোসী

এ-গল্পের পরিবেশ গ্রামীণ। নিটোল, স্নিগ্ধ পল্লীর রূপ আবদুর রউফ চৌধুরীর অন্য-গল্পে থাকলেও এতে আছে এক শ্রীময় হাতের স্পর্শ। আর একটি বিষয় এ-গল্পে পরিস্ফুটিত, যে-অঞ্চলের পটভূমিতে গল্পটির প্রাণকেন্দ্র নির্মিত তা হচ্ছে নদীর তীর-সংলগ্ন একটি অঞ্চল, যেখানে ধান-ক্ষেতের চেয়ে ঝিঙের জমিই বেশি। এ-গল্পের নায়ক, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে এক কুঁড়ে ঘরের বসিন্দা, তরমুজ। সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে গভীরভাবে। তার অপর যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা হচ্ছে:

> [...] সে নিজের স্বার্থ ছাড়া এ-জগতে আর কিছুই বুঝে না। দুটো পয়সার জন্য কিনা করতে পারে। অলস-অকর্মণ্য জীবনযাপন করে বলে হয়তো সে নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবে। স্বীয় পন্থায় উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে না, হয়তো-বা করতে রাজিও না; যদিও কিছুদিন পরের জমিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছিল, তবুও না, তবে সে জানে দশ-টাকার কাজ না-করলে পাঁচ-টাকার মজুরি পাওয়া সম্ভব নয়। কিছুদিন দালালিও করেছে বটে, হোক না সে গরুর দালালি বা জমির দালালি বা মাটির দালালি, কিন্তু এসব কাজে সে নিজের মনে শান্তি পায়নি, বরং তার সামনে মানুষের নিষ্ঠুর চেহারাই নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্রমে সে হাড়ভাঙা শ্রমকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারপর বৈধ উপায়ে টাকা উপার্জনের ধান্দা ছেড়ে গোপন ও অপ্রকাশ্য যত প্রকার নীতিবিগর্হিত পন্থা তার জানা আছে সেসব পথেই অগ্রসর হয়।[৬২]

এ-গল্পে আবদুর রউফ চৌধুরী এক জয়-দীপ্ত-দৃপ্ত অন্তরের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সুস্থ সমাজে অস্বীকৃত চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি কাজে সিদ্ধহস্ত তরমুজ। শুধু উপযুক্ত শারীরিক কাঠামো ও সাহসের অভাবে সে দস্যুবৃত্তিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি, তবুও  অন্যায় পথে জীবিকা নির্বাহ করতে তার কোনও সমস্যা নেই। আলস্য স্বভাবের তরমুজ উর্পাজিত অর্থ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কর্মে সম্পৃক্ত করতে চায় না। অসহায়তা কিংবা অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার পীড়ন তার জীবনের নিত্য সঙ্গী। সহধর্মিনীর সঙ্গে তরমুজের সৌহার্দ্য ও মমতাপূর্ণ সম্পর্ক। সে বারুখানের ভোগ থেকে তার বউকে ভাগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তার বউয়ের রূপের মোহে সময় পেলেই  বারুখান তার কাছে যাওয়া-আসা করে; ব্যবসায় ঝুঁকি নিয়ে টাকা কর্জ দেয়, তরমুজের অতিরিক্ত কোনও আবেদন অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পূরণ করে। তরমুজ খাটলে তার রোজগার বৈধ ও আরও নিয়মিত করতে পারত, তবে তার ভালোবাসা তার স্ত্রীর প্রতি খুবই গভীর, সে বলে, 'চাইছলাম বউটারে লইয়া সুখর এক সংসার বানাইতে। বউটার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো আর পথ তুকাইয়া পাওয়া প্রেমট্রেম না, যে আতখা আইল আবার আতখা পলাইয়া গেল।'[৬৩] তবে সে তার প্রচণ্ড রাগের সময় চোখ রাঙ্গালেও কখনও তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে না। এই সংযম প্রদর্শনই তার রূপমুগ্ধ রুচিস্নিগ্ধ মার্জিত মনেরই প্রকাশ। স্ত্রীর চোখে জল দেখা দিলে তার অন্তর গলে যায়; কিন্তু তরমুজ এক রৈখিক চরিত্র নয়, সে দ্বন্দ্বময় চরিত্র। সে তার অপরাধবোধ সম্পর্কে সচেতন। আজন্ম সে যে পেশায় অভ্যস্থ সেই চোর্যবৃত্তি নিয়েই তার মন দ্বন্দ্বময়। 'সে মন্দ হতে চায়নি, তবে বাঁচতে হবে। চারদিকের অবিরাম ক্ষয়ের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়নি, কিন্তু...।'[৬৪] আত্মগ্লানিতে পীড়িত তরমুজ নেতিবাচক জীবন পরিত্যাগ করে সুস্থ-সুন্দর জীবনে উন্নীত হওয়ার বাসনায় দীপ্ত হলেও সে তার পুরনো অভ্যাসের কাছে পরাভূত হয়। 'হে আল্লাহ মানসম্মানএ আমারে ফিরাইয়া আইন্অ। আমার তাকদির তোমার লেখা মোতাবেক কাম করতাছে। আমার দোষ নিও না হে খোদা। তোমার হুকুম ছাড়া গাছ'র পাতাও লড়তে পারে না। তোমার হুকুমঐ চল্লাম।'[৬৫] এ-গল্পে চোরের দুটো কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি ছেলেমেয়ের উপোস আর অন্যটি অর্থের অভাবে তার স্ত্রী যেন বারুখানের সঙ্গে চলে না যায় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

তরমুজের অনৈতিকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বভাব এবং তার স্ত্রী-র প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দুটো বিষয়ই অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন লেখক। তরমুজ হয়ে উঠেছে সর্বার্থে বিশ্বাসযোগ্য একটি মানুষ। তরমুজের স্ত্রীর চরিত্রও সুচিত্রিত। তরমুজের ভালোবাসা সে গ্রহণ করে এবং প্রতিদানও দেয়। সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সে অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত বাবরুখানের বাড়িতে কাজ করে তার স্বামীকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। স্বামীকে ভালোবাসে বলেই সে চৌধুরী-বাড়ি থেকে তরমুজ চুরি করার পর সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরে এলে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় তার আশ্রয়ে; এরকম চৌর্যবৃত্তি অসমর্থন করা সত্ত্বেও। তরমুজ ও তার স্ত্রীর চরিত্রের স্বাভাবিকতা, তাদের আচরণ-বৈকল্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এরসঙ্গে লেখক প্রথম সারির চলচ্চিত্র-পরিচালকের মতোই তাঁর কলমের রেখায় এই গল্পের কাহিনীকে দৃশ্যমান করেছেন।

স্নান

আবদুর রউফ চৌধুরী ঘটনা নির্মাণে সুদক্ষ। একইসঙ্গে তাঁর প্রাঞ্জল বর্ণনার গুণে একটি ক্ষুদ্র স্থানও হয়ে উঠেছে রূপময়। এ-গল্পের প্রধান আকর্ষণ এই বর্ণাঢ্যতা। লেখক যেন কলরব মুখরিত জনপদের চেয়ে একটি নিস্তব্ধ স্নানাগারের ছবি আঁকতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। মানুষ যেখানে আশ্রয় নেয় স্নানের জন্য সেখানের বর্ণনাটি এত স্বচ্ছ যে পাঠকের অনুভূতি একাত্মতা খুঁজে পায়। কাকলীর সুর-ছন্দ গদ্যময় পৃথিবীর অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। প্রবাসী বাঙালি লেখকদের মধ্যে আবদুর রউফ চৌধুরী প্রথম সক্ষম

[৬২] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৩] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৪] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৫] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

শিল্পী যিনি ক্ষণিকের ঘটে-যাওয়া ঘটনার আবরণে একটি বলিষ্ঠ চিন্তাকে প্রস্ফুটিত করতে সফল হয়েছেন। গল্পটির আবহ তৈরিতে লেখক সার্থক। পরিবেশ সরস। গল্পরীতির গুণে প্রবাসী মেজাজটি পাঠককে আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট করে। একটি বিষয় এ-গল্প পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি তখনও পাকিস্তানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। বিশেষ করে পাঠান-পাঞ্জাবি ও বাঙালির মধ্যে যে অসৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এটি তারই নিদর্শন। প্রবাসে বাঙালির সামাজিক পটভূমিতে যে জীবনাদর্শের উন্মোচন ঘটে তিনি তার অন্তর্নিহত সমস্যাকে তত্ত্বগতভাবে নয়, সরেজমিনে বিচরণ করে সার্থকভাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন :

১. পাশ থেকে একটি নারীর চঞ্চল সুর ভেসে এল, এর মধ্যে যেন একটি পুরুষহীন জীবনের হাহাকার প্রকাশ পেল।[৬৬]
২. আমি চার বছর পর দেশে ফিরে ছ-মাসও থাকতে পারিনি। যাওয়ার আগেই আমার একমাত্র ভাই একখণ্ড জমি খরিদের সর্বাঞ্জাম করে রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি গ্যাঞ্জাম করলে ভাইটি আমার মানবে কেমন করে! [...] একান্নবর্তী পরিবারের সুখ-সুবিধা আর গুণগাথাকীর্তন করতে করতে গাজীর বয়ানের মতো আমি আম্মার সুরে সুর মিলাতে না-পেরে পালিয়ে এলাম একপ্রকার অতিষ্ট হয়ে।[৬৭]
৩. [...] তার দেহ–বিলাতি কষ্টিপাথরের ধাক্কা খেতে খেতে কেমন যেন ঝরে পড়েছে।[৬৮]
৪. [...] পাঞ্জাবিকে দিগম্বর বেশে দেখতে পেয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। [...] ইংরেজের সংস্পর্শে এসে হয়তো পাঞ্জাবিরা এভাবে নাঙ্গা হয়ে স্নান করার স্বাদ পেয়েছে।[৬৯]
৫. পাঞ্জাবি এয়ারম্যানদের সঙ্গে পাঞ্জাবিতে গল্প করে, আমাদের কাছে আসতেই কর্পোলটির মেজাজ বিনা কারণে বিগড়ে গেল। পাঞ্জাবির প্রতি যেমন ছিল তার অগাধ আশা-ভরসা, তেমনি ছিল বাঙালির প্রতি অপরিসীম সন্দেহ আর ভয়। তার ধারণা ছিল, অপদার্থতায় নিখিল পাকিস্তানে বাঙালির সমকক্ষ আর কেউ নেই; তাই মনে মনে বাঙালির সদগতির উপায় নির্ধারণ করত; [...]।[৭০]

আবদুর রউফ চৌধুরী এ-গল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি খণ্ড মুহূর্তকে চিত্রিত করেছেন। যেখানে আছে সমস্যা, সঙ্কট, আত্মজিজ্ঞাসা সব মিলে পরিপূর্ণ জীবনকে জানার প্রয়াস। এ-গল্পে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছবি আছে, কিছু সুখের কিছু দুঃখের; তবে সচল জীবনধারার একটি সুগীত ধ্বনি গল্পের আবহে ক্রিয়াশীল। এখানে আবদুর রউফ চৌধুরীর দ্রোহ সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং সাধারণ জীবনাচরণে মমতার বন্ধন যেখানে উচ্চারিত তারই সন্ধান পাওয়া যায়। স্মৃতিচারণে আছে লেখকের দেশকে জানার দুর্দমনীয় ইচ্ছার প্রকাশ।

যৌতুক

যৌতুকপ্রথাকে উপজীব্য করে গল্পকার লিখেছেন 'যৌতুক' গল্প। মাওলানা মোহম্মদ আবদুস সবুর আখন্দ তার পুত্রের বিয়েতে রঙিন টিভি যৌতুক দাবি করেন। কোনও ভাবেই তিনি যৌতুক ছাড়া বিয়ে করাবেন না। ফলে বিরোধ বাঁধে কলেজ পড়ুয়া, জিনস্-পরা তার ছেলে জাফর ইকবালের সঙ্গে। পিতা ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যৌতুক গ্রহণকে জায়েজ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, অন্যদিকে পুত্র আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্ম ও সামাজিক অবস্থার যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে পিতার যুক্তির অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করে। যখন মাওলানা সাহেবের ভাগ্নি শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের জন্যে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে তখন তার বোধদয় হয় এবং যৌতুক ছাড়াই পুত্রের বিয়েতে তিনি সম্মত হন। গল্পকার আবদুর রউফ চৌধুরী তাঁর লেখনী সর্বদাই কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ গল্পেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সে সঙ্গে নিজে কষ্টে না পড়লে যে অন্যের কষ্ট অনুভব করা যায় না তার প্রমাণ করেছেন।[৭১]

ট্যাকরা-ট্যুকরি

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'ট্যাক্‌রা-ট্যুক্‌রি' গল্প। এই গল্পে লেখকের মনস্বিতার পরিচয় সুস্পষ্ট। নারী নির্যাতন, নারী অধিকার, ধর্মেও নামে নারীকে দাবিয়ে রাখা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে মৌলভীদের দৌরাত্ম্যে কীভাবে শিশু ও নারী নির্যাতিত হচ্ছে তা লেখক তুলে ধরেছেন।[৭২]

[৬৬] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৭] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৮] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৬৯] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭০] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭১] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।
[৭২] অনিরুদ্ধ কাহালি, আবদুর রউফ চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৬), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০।

৩.

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে, প্রায়ই দেখা যায়, চরিত্রগুলোর বহিঃসংঘাত ও অন্তঃসংঘাতে যে আবহ টানটান হয়ে ওঠে সমগ্র বয়নে, তারই পরিণাম হিশেবে এসেছে একটি শেষ আলোড়ন–অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের শেষে। তাই বলা যায় যে, আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে একটি 'শেষ মোচড়' আছে। কখনও এসেছে দাম্পত্য জীবনের জটিলতায়, বিচ্ছেদে, কখনও-বা একটি অস্ফুট-উচ্চারিত বাক্যের সূক্ষ্মতায়। কিন্তু 'শেষ মোচড়'-এ পৌঁছনোর জন্য আবদুর রউফ চৌধুরী যে-পথ অবলম্বন করেছেন, তা হচ্ছে অজানাকে জানার আবহ গড়ে তোলা। আর অজানাকে জানার আবহ গড়ে তুলেছেন পরিবেশ-বর্ণনায়, চরিত্র-বিন্যাসে ও সংলাপ সৃষ্টিতে। সবকিছুরই দক্ষ প্রয়োগ তিনি জানতেন।

আবদুর রউফ চৌধুরীর 'শেষ আলোড়ন' নির্মাণের উপজীব্য হচ্ছে মানুষ, বিশেষ দেশ ও কালের মানুষ। তিনি দেশ ও কালের বিশেষ পটের মানুষকে দেখেছেন, ভেবেছেন; তারপর সেই মানুষের সমকালের নানা সমস্যা-আকাঙ্ক্ষা-জীবনযাত্রা, তার বাস্তবতা ও কল্পনাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আলোকিত করে সচেতন প্রযত্নে তাঁর গল্পের প্রতিমায় গড়ে তুলেছেন। তাঁর সময়টায় বাংলাদেশের রুদ্ধগৃহের দরজা-জানালা খুলে যাচ্ছিল ক্রমশ। বাংলাদেশের ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ নানামুখী সংঘাতে আন্দোলিত হচ্ছিল এবং বদলে যাচ্ছিল অনিবার্যভাবে। বাঙালি জীবনের সেই রূপান্তরের পর্বই আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পের কাহিনী নির্মাণের উপাদান। তিনি তাঁর কাহিনী নির্মাণে সংস্কারবাদের প্ররোচনায় একান্ত শিল্পীর মতোই পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি এঁকেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে কৃষক ও কৃষিমজুর, গ্রামীণ ও শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক, উদ্ভিদসুলভ জনগণ নিরঙ্কুশ আধিপত্য পেল। তিনি তাদের সমস্যার তল খুঁজে খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন সহানুভূতির সঙ্গে। যে বাঙালি সমাজের ভিতর থেকে জন্ম নিচ্ছিল ভবিষ্যৎ (স্বাধীন দেশের সৃষ্টি, রাজনীতি ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন), জন্মযন্ত্রণায় যার সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল সেই দেশ ও কালের মানুষই তাঁর ছোটগল্পের উপাদান। সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, বাঙালি ও অবাঙালির বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষ ও মৌলভির বিরোধ। যেমন 'নেশা', 'স্নান', 'রানী', 'সৃষ্টিতত্ত্ব', 'জিন' প্রভৃতি। কাহিনী-বিন্যাস নিয়ে আরও কথা আগেই বলা হয়েছে।

'শেষ মোচড়'-এর একমুঠো উদাহরণ:

১. কথাটি শোনামাত্রই আমেনা রক্তজবা চোখে তাকাল তার স্বামীর দিকে। আমেনার চোখ-দুটো যেন । তারপর মুখ ভেংচে বলল, 'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?'[৭৩]

২. ভদ্রলোকটি একপলকে সুগভীর-তীব্র আবেগপূর্ণ বেদনা প্রকাশ করে, ঘাড় বাঁকিয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে অস্ফুট ভাষার প্রলেপ মেখে, দেহে গোধূলিলগ্নের অস্তে-যাওয়া সূর্যের বঞ্চিত বাসনার স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। তবে তার ব্যর্থজীবনের শ্রান্তির ও দুর্বলতার দীর্ঘনিশ্বাসটি স্নানাগারের দরজায় লেপটে রইল। এই লেপটে থাকা ব্যর্থতার মাঝেই অমল অনুসন্ধান করতে লাগল তার বৌদিকে আবার।[৭৪]

৩. আর দু-দিন পরই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সন।[৭৫]

৪. একচমকে শতাব্দীসুপ্ত ভীতু পিতার শরীরে শক্তি সঞ্চয় হল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগে উঠল এক নতুন স্পৃহা–সন্তানকে রক্ষা করা যেমনি তারই কর্তব্য ঠিক তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করা তার মতো পিতারই দায়িত্ব।[৭৬]

৫. মদচ্ছির আলীর মন্তব্যে তার আহতান্তরে নব জীবন রচনা করার স্পৃহা জেগে না উঠলেও ঠিকই তার হৃদয়ের একাংশ নবদীপ্তিতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল।[৭৭]

৬. জায়েদার চোখের সামনে অনেক অন্যায় হয়ে গেছে, মুখ খুলে কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি, কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে চাচ্ছে না, তবুও মুখ ফুটে কিচ্ছুই বলতে পারছে না, শুধু মাফিকের বুকে তার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবতে লাগল, ঠিক পারব তো অতল অন্ধকার পাড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে নতুন করে বাঁচতে![৭৮]

৭. 'না, না! এমন ঘটনা ঘটার তো কথা ছিল না! সমশের তো কথা দিয়েছিল যে, সে এ-বিয়েতে বাধা দেবে না। কিন্তু এখন...।'[৭৯]

৮. 'আমারে নাইওর দিলা না কেনে?'/ উত্তর শুনে মদরিছ আঁতকে উঠল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'পঞ্চাশ টাকা আজাইরা কুয়াইলাম।'[৮০]

৯. রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদ স্থাপন করা একটি আস্ত ভুয়ো জিনিশ–এতে পরলোকে হয়তো-বা শান্তি পাওয়া যাবে, তবে নিজের আত্মা শান্তি পাবে না, এমনকী ছেলেমেয়েও উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হবে না, শান্তির আশ্রমে আশ্রয় নিলেও বাস্তব জীবনের নির্মমতা থেকে বাঁচা যাবে না।[৮১]

[৭৩] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৪] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৫] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৬] পিতা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৭] নীলা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৮] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৭৯] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮০] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

১০. কিছুক্ষণ পর ইকবাল এসে জানাল, 'আব্বা বলেছেন, আপনি পাত্রী-পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে বিয়ের দিন-ক্ষণ ধার্য্য করে নিতে। তিনি আরও বলেছেন, বিয়েতে দাবি-দাওয়া না থাকাই বাঞ্ছনীয়।'[৮২]

প্রত্যক্ষত আত্মজীবনীমূলক সবসময়ে না-হলেও আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে আত্মজীবনের উপাদান-ব্যবহার অনেক সময়ে বিশেষ এক-ধরনের শিল্পের জন্ম দিয়েছে। 'আত্মব্রত', 'জিনা' গল্পগুলোর মতোই 'নীলা', 'বন্ধুপত্নী' গল্পগুলোতেও লেখক-ব্যক্তিত্ব স্বপ্রকাশিত। কনোও কোনও গল্পে বর্ণনামূলক রীতির–কিন্তু স্বীয় অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদি–ব্যবহারে কিছুটা আত্মজীবনীমূলক হয়ে উঠেছে। তবে আবদুর রউফ চৌধুরী গল্পবৃত্ত থেকে ঈষৎ বহির্ভূত কোনও কথক-চরিত্রের উক্তি ব্যবহার করেননি, বা নিমগ্ন আত্মকথনও না, অথবা আশ্রয় নেননি সাধারণ বিবৃতিমূলক রীতির–সর্বক্ষেত্রেই গল্পে বর্ণিত ঘাটনার সঙ্গে সচেতন শিল্পীর মতো যে মমত্ব ও নিরাসক্তি সমন্বিত সঠিক অবস্থান থাকা প্রয়োজন তা তিনি করেছেন। চরিত্র উদঘাটনে তিনি পারদর্শী। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ মুহূর্তগুলো যেমনি তেমনি চরিত্রগুলোও অনির্বচনীয় রূপে প্রতিভাত হয়েছে তেমনি মাটি ও জলের সঙ্গে বাঙালির যে নাড়ীর যোগ তাও তাঁর গল্পে ওতপ্রোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ পল্লীজীবনে বা প্রবাসজীবনে যে অতল রহস্য ও সম্ভাবনা থাকে তা লেখকের অনুভূতিকে বারবার নাড়া দিয়েছে। সমস্যা কণ্টকিত জীবনে যে বেঁচে থাকার প্রেরণা আছে, দীপ্তি আছে তিনি সে উপাদান প্রত্যক্ষ করেছেন। কোনও কোনও গল্পে নারীসমাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন; তবে নারীদের তিনি প্রধানত পুরুষের চোখেই দেখেছেন। আবদুর রউফ চৌধুরীর গৃহিণীরা গৃহবাসিনী ও গৃহকর্মে নিরত। সেইসঙ্গে নারীর উপর পুরুষ কোথাও কোথাও অনুশাসন আরোপ করেছে, তাকে সর্বতোভাবে অধীনে রাখতে চেয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নারীর রূপের এবং ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে গেছে এবং ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হয়েছে নারীকে ঘিরেই। আবার কোথাও কোথাও নারী সচেতন, সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। সৃষ্টির নিরন্তর প্রেরণায় আবদুর রউফ চৌধুরী শিল্পীর মতোই চরিত্র উদঘাটন করেছেন। সহজ, সরল জীবনচর্যায় যে একপ্রকার লালিত্য ও বর্ণসুষমা থাকতে পারে তিনি তাঁর ছোটগল্পে সেই সাক্ষ্যই বহন করেছেন।

৪.

আবদুর রউফ চৌধুরী জাতশিল্পী, তাই তাঁর ছোটগল্পে গল্পের নিরাভরণ রূপ ও রসে সমৃদ্ধ। প্রতিটি গল্পই শিল্পোত্তীর্ণ। তিনি এমন একজন গল্প-লেখক যাঁর এক-একটি গল্পের কৃৎ-কৌশল পাঠকের সামনে বহুসম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ 'ঐক্য-সঙ্কট' নির্ভুলভাবে পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। উপকরণের মাধ্যমে উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনযাপনের বহুস্তরান্বিত কৃত্রিমতাকে, আত্মছলনাকে, স্বার্থপরতাকে পরতে পরতে লেখক উন্মোচন করেছেন। এইসব গল্পের বক্তব্যে ঋজুভাব, পরিমিতি বোধ, ছোটগল্পের কাঠামোতে নিটোল পারিপাট্য তার শিল্পচেতনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। তাঁর গল্পে যে পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তা গল্পের ভাবসম্পদের অনুসারী। আর প্রবাসী গল্পগুলোতে স্বদেশভূমির প্রসঙ্গটা এনেছেন সুদূরপ্রসারী চিন্তাপ্রবাহের অনুসঙ্গে। এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, মাটি, মেঘ, কুয়াশা, জল বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি করেছে। তিনি একজন মুক্তচিন্তার অনুসারী মানুষ ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে কোনও রকম গোঁড়ামী তাঁর ছিল না। এজন্যই তিনি ব্যতিক্রমী, আর এই ব্যতিক্রম তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁর গদ্যরীতির যে সাবলীলতা তা-ও এসেছে তাঁর বিশিষ্ট জীবনধারার অনুসঙ্গে। সৌন্দর্য-দর্শনের কথাও এসেছে তাঁর গল্পে; যেমন– 'রানী' একটি সৌন্দর্য-দর্শনের কাহিনী, আবার অন্যদিক থেকে একটি প্রবাসী নারীর প্রতি তার স্বামীর অবহেলারও এক আখ্যান। 'জিন', 'ভূত ছাড়ানো', 'ট্যাকরা-ট্যুকরি' প্রভৃতি যেমন নারীর প্রতি সামাজিক নির্যাতনের গল্প, তেমনি কুসংস্কার-বিরোধী গল্পরূপেও মর্মস্পর্শী। সব গল্পই অবশ্য এমন নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় না, তবুও আবদুর রউফ চৌধুরীর এমন গল্প আছে একাধিক–যাদের একটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে দেখতেই লেখা হয়ে যেতে পারে আর একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রচনা। খুব বেশি লেখক সম্পর্কে এমন দাবি করা চলে না। স্বচ্ছ জলধারার মতোই তাঁর চিত্রণ, ব্যঞ্জনাবহুল, রসসমৃদ্ধ। তিনি চরিত্র ব্যাখ্যায়, ঘটনা বিবরণে এবং সর্বোপরি দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা যথাযথ। তবে পরিবেশ সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলতে গেলে নিম্নের একমুঠো উদাহরণই যথেষ্ট:

১. সিন্ধুপাড়ে সুখের নীড় বাঁধলেও কী গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের কথা ভোলা যায়! হয়তো-বা তাও নয়, হয়তো বিষাদ ফুটে উঠেছে অন্য কারণে–স্বামীর সঙ্গে একা একা সন্ধ্যাটি কাটিয়ে দেওয়ার আনন্দের শিরশিরানি, অন্তরে জেগে-থাকা বাসনাটি অকারণে অস্ত গেছে বলে, কোথা থেকে এক বন্ধু এসে সুসময়টুকু নষ্ট করে দিল।[৮৩]

২. অকালের বাতাস যত চমকে ওঠে বৃষ্টিও তত ঝুমুর ঝুমুর তাল তুলছে, তারপর বৃষ্টি ও বাতাস একসঙ্গে মাটির ঘরের ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। পাশের বাড়ির মরচে ধরা টুটোফুটো টিনের ওপর আছড়ে পড়া অসংখ্য বৃষ্টিকণার অসহ্য আওয়াজে ছনের ঘরের মধ্যে বসেও বোবা-কালার মতো কা-কা করা ছাড়া উপায় কী!

[৮১] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮২] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৩] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

চিৎকার করে কথা বললেও মনে হয় কানের কাছে কে যেন শুধু ফিসফিস করছে, তবুও সিদ্দিক আলীকে কথা বলতে হচ্ছে, 'মাতছ না ক্যানে?'[৮৪]

৩. তার হেঁটে-যাওয়া পথের পাশে, ডুবে-যাওয়া খালের ভেতর থেকে, আকাশের ডাক শোনার লোভে ভেসে উঠেছে কই-মাগুর, উজাই যেন। ভেসে ওঠা মাছগুলোর পাশ দিয়ে কোঁচড়হীন পথিকের মন্থরগতিতে চলে-যাওয়া পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যেও তরমুজ বিস্মিত চোখে দেখতে পাচ্ছে পথিকের চোখ-দুটো কই-মাগুর ধরার লোভে যেন বড় বড় হয়ে উঠেছে, তার পুতলির মধ্যে যেন শয়তানের আস্তানা।[৮৫]

৪. এক শনিবার অমল এই আধমাইল পথ পেরিয়ে, নিশ্চুপে ব্রিকলেনের বাঙালির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে, পুরাতন একটি ফ্যাক্টরির পাঁচিল ঘেঁষে, মাথাভাঙা ওক গাছটিকে পাশ কাটিয়ে, জুতোর শব্দের সঙ্গে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা পত্রিকার পাতাগুলো শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এলোমেলোভাবে উড়িয়ে, তার বন্ধুর দেওয়া ঠিকানায় এসে উপস্থিত হল।[৮৬]

৫. নদীর উভয় কূল প্লাবিত। ঢেউয়ের তালে নৌকা দোলছে বিষম বেগে। তুফান নৌকার ছাদ ও বর্গার ঝুঁটি ধরে প্রলয়তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত। ঝরে-ছিঁড়ে-ভেঙে পড়ছে বর্গা সব। ছাদ ভেঙে ছইয়ের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, যেন পেতনীর দাঁত, এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী, কোলে তার কম্পমান বছর দেড়েক শিশু; মা'র বুকে দুধ নেই, শুকনো; ফানুস ফেটে বায়ু বেরিয়ে গেছে যেন।[৮৭]

৬. [...] উত্তর পাশে একটু খালি জায়গা আছে যেখানে একটি গোলাপ ও দুটো গন্ধরাজের গাছে ফুটে থাকা ফুলগুলো পাশের গোবরের ঢিপির গন্ধকে প্রশমিত রাখার ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যস্ত।[৮৮]

৭. [...] একটি শঙ্খচিল সমুদ্রের পথ ভুলে, আকাশে, মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে লাগল, অবশেষে সে তার ক্লান্তি দূর করার জন্য নাসরিনদের বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিল। আর তখন তার পালকে ফিরে-আসা সূর্যের ঝাপসা আলপনা তৈরি হতে লাগল। কিন্তু সূর্যের এই আলপনা আমাকে স্পর্শ করতে পারল না, গুম হয়ে আমি দরজায় নক করলাম। কপাট খুলে দিল নাসরিন, তার শাড়ির আঁচলে হলুদের রাজত্ব।[৮৯]

৮. অজস্র স্রোতস্বিনীর দেশে বর্ষাকালে প্রত্যন্তাঞ্চলে চলাচল করার জন্যে নৌকার ব্যবহার অপরিহার্য, এসময় পাঞ্জাবি-পাঠান জওয়ানদের নাজেহাল করার সুযোগ বাঙালির সামনে এসে দাঁড়ায় সহজেই। খেয়ানৌকায় উঠলে তাদের হাঁটু কাঁপে। তারা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। ছাতুভোজী কিনা তাই হয়তো![৯০]

৯. [...] পার্বত্য ত্রিপুরায় জন্ম নেওয়া উপজাতীয় উদ্যাম মনু নদী বনজঙ্গল ভেঙে যখন ধেয়ে আসবে শাখা-বরাকের দিকে, বীর্যবতী করার উদ্দেশে, তখন গাছতলার ও মেঠো গৃহবাসী ত্বরমান জলের দাপটে দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে লাশ হয়ে ভেসে বেড়াবে বা অপরপাড়ে পাড়ি জমাবে অদৃষ্টের বঞ্চনায়।[৯১]

১০. [...] তাদের পাশ দিয়ে একটি মহিলা চলে গেল। মহিলাটির পেছন থেকে নিরীহ মুখে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামার পর তাজিদুল্লা যোগ করল [...] ।[৯২]

পরিবেশ বর্ণনার বাস্তবগুণ ও বাস্তবতার অভ্যন্তরণে প্রবাহিত লেখকের প্রবাসজীবন, স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর সামাজিক ও গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। উদাহরণগুলো পরিবেশ বর্ণনায় লেখক কী পরিমাণ সফল হয়েছেন তার সাক্ষ্য বহন করে। বাসস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দুটো বিপরীত উদাহরণ এরকম:

১. 'চা আনি'–বলে পর্দা সরিয়ে রানী চলে গেল রান্নাঘরে, আর তার পিছনে দুলতে লাগল পর্দার প্রতিটি ভাঁজ; সেখানে ইস্ত্রির কোনও নিটোল চিহ্ন নেই, সেলাইয়ের পরতে পরতে শুধু জমে আছে ধুলোর তারকাঁটা, সুতোর মাঝে মাঝে যেন দুর্বোধ্য ও দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপের উপর জমে ওঠা বেদনার একরকম রহস্যময়ী জীবনগাঁথা সগর্বে আত্মপ্রকাশ করছে।[৯৩]

২. বসারঘরের পরিবেশটিও ওর মতো শান্ত তবে অদ্ভুত; সাজানো হয়েছে রুচিসম্পন্ন ভাবে; বাংলার যত কুটিরশিল্প আছে সবকিছু এনে যেন ঠেসে দেওয়া হয়েছে এই ড্রইংরুমে।[৯৪]

আবদুর রউফ চৌধুরী তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি তাঁর গল্পে তাঁর অতিচেনা ভুবনটিকে অন্তরের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন। শুধু মানুষ নয়, পশুদেরও যে একটি রূপ আছে, বর্ণ আছে–তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়:

---

[৮৪] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৫] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৬] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৭] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৮] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৮৯] বন্ধুপত্নী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯০] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯১] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯২] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৩] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৪] বন্ধুপত্নী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

১. তরমুজ কিছুক্ষণের জন্য নিজের মধ্যে ডুবে থেকে দোকানের বারান্দায় ঝুলন্ত আলোটি দেখতে লাগল। সে যেন গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষায়, তবে ভাঙা দাওয়ায় আশ্রয় নেওয়া কুকুরটির কাছে ঝাপসা অন্ধকারই প্রিয়। সে এই আলো-অন্ধকারে লেজ গুটিয়ে সামনে ছড়ানো তার পা-দুটোর ওপর মুখ পেতে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে; কিন্তু তরমুজের চোখে তা ধরা পড়ল না, সে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলার দিকে তাকিয়ে রইল। কাশির শব্দে কুকুরটি মুখ তুলে কান-দুটো খাড়া করল, তার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি আরও প্রবল, তবে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই অস্পষ্ট, তাই শব্দের সন্ধান করতে সে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।[৯৫]

২. হঠাৎ জানালার পাশ থেকে একটি বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, পাতাঝরার মতো নিঃশব্দে। তারপর পা টিপে, সন্তর্পণে এগিয়ে এল গোরার দিকে। ফিকে-নিকষ-হিমেল আলো ভেঙে গোরা হাত বাড়িয়ে বিড়ালের পিঠ ছোঁয়াতেই সে যেন কেমন নড়ে উঠল; পশমে ছোট ছোট তরঙ্গ, মৃদু কম্পন সৃষ্টি হল। ক্ষণিকের জন্য সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে গোরার হাত ও বাহু বেয়ে টেবিলের নিচে লুকিয়ে যাওয়ার মতলব খুঁজতে লাগল।[৯৬]

৩. এ-ধরনের বিড়াল বাসা-বাড়িতে থাকার কথা নয়, আর যদি-বা থাকে তবে গম্ভীর ভঙ্গিতে করিডোরের মাঝখানে নিশ্চুপ বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু এই পাহাড়ি বিড়ালটি সেরকম নয়।[৯৭]

৪. গোয়ালঘরে ছয়টি বলদ ও দুটো গাভী পচা কচুরিপানার উপর দাঁড়িয়ে তাজা কচুরিপানা খাচ্ছে, ছয়টির মধ্যে একটি ভীষণ কালো, বিদেশী হবে, দেহের শক্ত বাঁধনের উপর মস্ত বড়ো এক ঢিবি, আর পরিচ্ছন্ন লম্বা লেজটি মাছি তাড়ানোতে ব্যস্ত, কিন্তু দেশীগুলোর ওপর সচ্ছন্দে মাছির মেলা জমেছে, তাদের সংখ্যা গৃহস্থের সচ্ছলতার পরিচয়।[৯৮]

৫. ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল সমরুমিয়ার দর্শনলাভে, সঙ্গে সঙ্গে একটি বাঁশের খেরকি ফাঁক করে কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল এক হাঁড়ি আবর্জনা; নিঃশব্দে সরে গেলেন সমরুমিয়া।[৯৯]

৬. নদীর পাড়ে, ভাঙা নৌকা-ঘাটে, তার শ্বশুরবাড়ির কুকুরটি দাঁড়িয়ে আছে। [...] এই প্রথমবারের মতো সে তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াই পিতৃগৃহে যাচ্ছে। এমনকী কুকুরটিও তার সঙ্গী হল না।[১০০]

৭. [...] সে চেয়ে আছে লায়নার উপর আঁকা ছবির প্রতি, যেখানে খরগোসকে পাকড়াও করার চেষ্টায় ব্যস্ত একটি কুকুর।[১০১]

৮. বিড়ালটি তার শিকার নিয়ে, টলমল পায়ে, এগিয়ে চলল দরজার দিকে। ভাঙা চৌকাঠের সামনে পৌঁছতেই, কী যেন কী ভেবে, সে থমকে দাঁড়ায়।[১০২]

৫.

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পের ভূমি নির্মিত হয়েছে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর, বাংলাদেশ সৃষ্টিসহ, কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে ঘিরে। যেমন :

১. পাকিস্তান আমলের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য।
২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।
৩. রাজনৈতিক উত্থান-পতন।
৪. অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ।

তাঁর ছোটগল্পের ভেতর আছে অন্যরকম স্বাদ; এসব গল্পে এসেছে লেখকের বাসস্থান– ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। এখানে ভৌগলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একজনের ভালোবাসা, বেদনা, হাসি, কান্না সবকিছুই এক, রক্তের রঙও এক–কাজেই একটি বড় ক্যানভাসে মানুষের গল্প চিত্রিত করেছেন গল্পকার। মানুষের মনের বিচিত্রতা, মনস্তাত্ত্বিকতা সবই যেন স্থান করে নিয়েছে তাঁর গল্পে। যেখানে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে গল্প লিখেছেন সেখানে চরিত্রের বিন্যাস হয়ে উঠেছে অনিবার্য শিল্পরীতি। মুক্তচিন্তাও তাঁর গল্পের ভাববস্তুর অবলম্বন। তিনি সমাজের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্তের চিন্তার যেমনি আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি উচ্চবিত্তের দৃষ্টিতে দেশ ও তাঁর সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বঞ্চিত মানুষের মর্মবাণী যেমনি তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তেমনি তিনি সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামকে সুষ্ঠুশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পে শ্রেণী সচেতনা এসেছে মূলত জীবনের সত্যকে উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে। সত্যানুসন্ধানী আবদুর রউফ চৌধুরী সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কামনা করেন, তবে সেই

[৯৫] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৬] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৭] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৮] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[৯৯] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০০] ট্যাকরা-ট্যুকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০১] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০২] পরিচয়, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

নবজন্ম আসুক বাস্তবতার ভিত্তিতে–সুখ-দুঃখ, কঠিন বাস্তবতার বিভিন্ন পর্যায়, সংকেত, সৌন্দর্য ও জীবন-দর্শন সবকিছুই–অলীক কোনও আশ্বাস-বিশ্বাস দ্বারা নয়। জীবনের সঙ্গে দুঃখ, সংগ্রাম এবং ভালবাসার সৃষ্টি সবই তাঁর চেতনায় পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। এদের নিয়েই পরিপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী। তিনি সংগ্রামমুখর, তবে শিশিরস্নাত রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীর অধিবাসী। তিনি যেমনি মানুষের জীবনের দুঃখ-অভাব-বঞ্চনাকে উপজীব্য করেছেন তেমনি জীবন থেকে কখনও পলাতে চাননি। তাঁর শিল্পচেতনা গভীর জীবনঘনিষ্ঠ। তাঁর গল্প-বিষয় ভাবনায় এসেছে বিচিত্রতা। তাঁর গল্পের আবহে প্রেরণা জাগিয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, প্রতিবাদ, শ্রেণী সচেতনতা, মানবতাবাদী চিন্তা ও প্রভাব। তাই তিনি বাস্তব জীবনের রূপকার, দ্রোহী কথাসাহিত্যিক।

আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পে সরকালনি সামাজিক সমস্যা ও সমাজ সংশ্লিষ্ট জীবনভাবনা বেশ প্রত্যক্ষ ও জোরালো। তাঁর ছোটগল্পে দেশের মাটি ও মানুষ অনেক বেশি ভূমি দখল করে আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর, জীবিকার নর-নারীর ভিড় তাঁর ছোটগল্পে। এখানে সারা বঙ্গদেশের জনসমাজের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ। অর্ধ-শতকের সামাজিক বিকাশের ধারাও এদের মধ্যে ধ্বনিত। রাজনৈতিক-সামাজিক-দার্শনিক বক্তব্য, প্রেম ও ধর্ম, বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্য, সুনির্দিষ্ট সমস্যা সবই স্থান করে নেয়। লেখক বড়ই অনিষ্করুণভাবে বাস্তবের মুখোমুখি। আবদুর রউফ চৌধুরীর ছোটগল্পে বিশ্লেষণে দেখা যায়:

(এক) অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাস সম্পর্কে আশ্চর্য সচেতনা।
(দুই) রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে সুস্পষ্ট বোধ।
(তিন) নারীঘটিত সামাজিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
(চার) নবপ্রজন্মের সঙ্গে পুরাতনের দূরত্ব।
(পাঁচ) প্রতিদিনের জীবনচিত্রে বিবিধ সমাজসমস্যার প্রতিফলন।

**(এক) অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাস**

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘাতের মধ্য দিয়ে। কোনও কোনও কাহিনীতে শ্রেণী-শোষণের রূরূপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, 'উপোসী', 'শাদী', 'ট্যাকরা-ট্যুকরি', 'ভূত ছাড়ানো', 'যৌতুক' ইত্যাদি। তবে প্রায়ই জীবনের, সমাজের অর্থনৈতিক সত্য ব্যাপকভাবে ধরা রয়েছে শোষণ ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মোটামুটি নির্ভুল অবস্থান নির্দেশের মধ্য-দিয়ে। লেখক জানেন, ব্যক্তিগত আচরণে-বিশ্বাসে-আবেগে মানুষের শ্রেণী-স্বভাব মুদ্রিত থাকে। ব্যক্তিত্ব কোনও শুদ্ধ অস্তিত্ব নয়। বাস্তবভাবে মানুষকে দেখতে গিয়ে তার সামাজিক ভিত্তি, শ্রেণী-চিহ্ন এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে অপরিহার্য ও ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে। আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে দুটো অর্থনৈতিক সত্য লক্ষ্য করা যায়: (১) পুঁজীবাদ, (২) সমাজতন্ত্র। যেমন:

১. আপনারা ভাগ্য বা তকদির শব্দের এমন ব্যাখ্যা দেন যে, যাতে ধনী-অভিজাত শ্রেণীর আরাম-আয়েশে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না-ঘটে, বরং ধনিক-বণিকের উচ্ছিষ্ট উপভোগের হীনস্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার বিধান বলে গরিবকে সান্ত্বনা দেন।[১০৩]
২. কলেজে পড়ুয়া অধিকাংশ ছেলেমেয়েই প্রথমে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়। তারপর স্তর থেকে স্তরান্তরে গমন করে। কেউ হয় ধনবাদী, কেউ-বা গণবাদী, আবার কেউ কেউ মৌলবাদের মূলে প্রবেশ করে। সুশিক্ষা ও পরিবেশ প্রথম দিকে তাদের অন্তরকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করলেও পরবর্তী কালে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা দলীয় স্বার্থে তাদের অন্তর আটকে যায়। ফলে তারা মানবেতর চিন্তাচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ইকবাল এখনও সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারায় আপ্লুত।[১০৪]
৩. 'কেউ গাছতলায় থাকতে পারবে না'–এ পার্লামেন্ট গৃহীত আইন; গৃহহীনকে গৃহ দেওয়া সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।[১০৫]

পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদার ও নানা পেশার বিত্তশালীদের ভূমিকার ছবি এঁকেছেন আবদুর রউফ চৌধুরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়:

১. মা'র একজন বিত্তশালী বেয়াই [মাজহারুল শেখ] অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে; তখন দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ চলছে, আর তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন [...] মাজহারুল শেখ [...] মূর্তিপ্রতীক হয়ে বসে আছেন সামনে, চেয়ারে। শত পরাবিদ্যায়ও প্রাণসঞ্চার হবে না তার। তিনি তো অপৌরুষের এবং অভ্রান্ত জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করতে চান না। চান না, দুঃখ-দ্বন্দ্ব-বিরোধ-অজ্ঞান–সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে অমৃতময় মুক্ত জীবনলাভ করতে। তার দেহ-মন-ইন্দ্রিয় সমন্বিত আত্মবুদ্ধি চৈতন্য জ্যোতিতে অপ্রকাশিত। তিনি গূঢ় সত্যকে সহজে উপলব্ধি করতে অক্ষম।[১০৬]

[১০৩] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০৪] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০৫] জিনা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০৬] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

২. আল্লাহ তাআলা রূহ সৃষ্টি কড়ইয়া রাখছওন। তার দুনিয়ায় আইত অইব; আল্লাহর কতা মুতাবেক। তবে ভাবইয়া পাই না, ফ্যাক্টরির মালিক জাফর-সাবর চার-বছর আগঅ এক পোয়া অঐছল তারপর আইজ পর্যন্ত আর কোন খবর নাই।[১০৭]

৩. জৈন্তার রাজবংশের এক উত্তরাধিকারী শিবচন্দ্র নারায়ণ বাবুর শানশওকত কিংবদন্তী তুল্য ছিল। তিনি নাকি গৌহাটী যেতে পারতেন পরভূমে পা না ফেলে। তারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় শিবসাগর দীঘি। ইংরেজ-সরকার তাকে ক্ষমতা দেয় তার অঞ্চলের অপরাধীকে ছয়মাস পর্যন্ত বন্দি করে রাখার। শিংমাছের গর্তে গলা-জলে ডুবিয়ে রেখে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের দেহকে বিষিয়ে দেওয়ার অধিকারও ছিল তার।[১০৮]

৪. অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও হাজার বছরে গড়ে ওঠা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে জিনসাধক পীর-মৌলোভীরা হাতড়িয়ে নিচ্ছে নিরীহ মানুষগুলোর অর্থকড়ি। তারা জুজুর ভয় দিখিয়ে শোষণ করছে শিশুর মতো সরলপ্রাণের গ্রাম্য মানুষগুলোকে।[১০৯]

মানুষ হিশেবে এসব মানুষ কত ছোট, মূল্যবোধে কতটা নিচু, ভাষায় অনেকখানি বিষ মিশানো থাকে সেকথা বলেছেন লেখক। আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা যারা ধরে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে। কোথাও এরা গল্পের কেন্দ্রে, কোথাও এদের ভূমিকা গৌণ।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে শ্রমজীবীশ্রেণীর মানুষের দেখাও মেলে। সেগুলো এমনভাবে লেখা যদি শ্রমিকেরা না থাকে তবে গল্প মার খায় না। আছে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, চোর, রাখাল, জেলে, মাঝি ইত্যাদি। এসব শ্রমজীবীরা আবদুর রউফ চৌধুরীর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল না। তিনি গ্রাম ঘুরেছেন, দেশ ও বিদেশ ঘুরেছেন, মানুষজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন। মানুষকে জেনেছেন, তাদের ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। ভিতর থেকে মানুষকে দেখে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে জটিল মিশ্রণে তাকে চিনে নেওয়ার কঠিন দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে পল্লীর অর্থনীতিতে যতরকম শ্রমজীবী মানুষ আছে তাদের তালিকা তৈরি করা অবশ্য লেখকের লক্ষ্য নয়। শ্রমজীবীশ্রেণীর মানুষের, বাংলার দারিদ্র্যতার প্রকাশের, কয়েকটি উদাহরণ:

১. এই পরিবারের  অবস্থা ও অর্থশক্তির পরিমাণ-পরিমাপ বছরের-পর-বছর এই ভাবেই অপরিবর্তন থাকবে হয়তো, যা ভগ্নস্তূপের মতো, চারপাশে শুধু ধ্বংসের আবহ।[১১০]

২. যে-লোকটি তার মেয়ের জন্য শাড়ি কিনতে ব্যস্ত তার পরনের কাপড়, পাঁজরের হাড়, দেহের সাজসজ্জা বাংলার দারিদ্র্যতারই প্রকাশ।[১১১]

৩. ঘরে ঢুকে কাঁদো স্বরে একজন ক্ষেতকামলা মদরিছ জানাল যে, তার স্ত্রী গত সাত-দিন ধরে ভূতের প্রভাবে আছাড়ি-পিছাড়ি যাচ্ছে। ভাঙছে সব বাসনপাত্র। চীনা মাটির দুখানা বরতন ছিল মেহমানের জন্যে, তাও টুকরো-টুকরো করেছে। গরিবের ঘরে ভঙ্গুর রাখেনি কোনও কিছুই।[১১২]

৪. তিনি জলসায়, মহফিলে গজল পরিবেশন করতেন। গজল গেয়ে ট্রেনে-বাসে মসজিদ-মাদ্রাসার জন্যে চাঁদা তুলতেন।[১১৩]

৫. 'আচ্ছা চাচা, এ-বুড়ো বয়সে গয়না নৌকার কাজ করছো কেন? গলুই ছাড়াতেই তো তোমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার কী কোনও উপযুক্ত ছেলে নেই?'/ 'পুয়া তাকিয়াও নাই। হকলতাই কপাল বাবাজি। কপালের লেখন খণ্ডাইতে পারে কেটা!'[১১৪]

### (দুই) রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিশ লক্ষ্য করার মতো:

(ক) কোনও কোনও গল্পে রাজনীতির ব্যাপার হঠাৎ এসেছে, যেন পূর্ব-প্রস্তুতিহীন, অথচ এত তাৎপর্যপূর্ণ তার প্রয়োগ যা অপরিহার্য বলে মনে হয়। যেমন 'যৌতুক'। এই গল্পের মূল সমস্যা মোটেই রাজনৈতিক নয়। কিন্তু সংবাদপত্রে নিবেদিতচিত্ত ইকবালের চিন্তার অংশ হিশেবে জাতীয় প্রসঙ্গের কথা এসেছে। সেখানেও কিন্তু একটি রাজনৈতিক দলের মনোভাবের প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশে গল্পকার অভ্রান্ত।

[১০৭] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০৮] ট্যাকরা-ট্যাকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১০৯] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১০] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১১] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১২] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৩] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৪] ট্যাকরা-ট্যাকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

> রাজশাহীতে শিবিরের হাতে ছাত্রনেতা রূপের হত্যার প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।[১১৫]

(খ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের রাজনৈতিক ভাবনা আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'অপেক্ষা', 'পিতা', 'বীরাঙ্গনা', 'বাহাদুর বাঙালি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গল্পের প্রেরণার মূলে সন্ধান পাওয়া যায় লেখকের রাজনীতি সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম। দেশপ্রেমিক লেখক মনেপ্রাণে পাকিস্তান শাসক-সমর-গোষ্ঠীকে ও রাজাকারদের ঘৃণা করতেন। প্রায় প্রতিটি গল্পেই এ ঘৃণা তিনি প্রকাশ করেছেন অকপটভাবে।

১. চার-বছর মাত্র ছাতুখোরদের সঙ্গে বসবাস করে উর্দুতে ভাবতে শিখেছে মাফিক, একথা ভাবলেই সে অবাক হয়। পাকিস্তানির সঙ্গে সম্পর্ক কোনও দিনই গলাগলির পর্যায়ে পৌঁছোয়নি, অনেক ক্ষেত্রে গালাগালিতেই পর্যবসিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-বাংলার সংযুক্তির সাধ প্রথম মিলনেই মিটে গেছে, ওদের আত্মম্ভরিতার আকস্মিকতায় [...]।[১১৬]
২. পাঞ্জাবিপ্রীতিতে আপ্লুত হয়ে পাকসেনাদের পদলেহনে অন্য যে-কোনও রাজাকার থেকে তালেব আলী পিছিয়ে নয়, বরং তাকে অন্যূন পদলেহনকারী বলা যায় [...]।[১১৭]
৩. তাজিদুল্লা একজন নামকরা রাজাকার, বাংলাদেশের শত্রু।[১১৮]

(গ) আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে নিটোল রাজনৈতিক ব্যঙ্গও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর স্বদেশবোধ এত খাঁটি ছিল যে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোকে তীক্ষ্ণভাবে কটাক্ষ করতে ভোলেননি।

> আজকাল রাজাকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি সাহস পায় না, কারণ তাদের প্রভাবাধীন সরকার দেশ শাসন করছে। জাতীয় পতাকার অবমাননা করতে ঘৃণ্য রাজাকার সাহস পাচ্ছে। জেলাশহর পৌর-মিলনায়তনে বুদ্ধিজীবীদের ফাঁসির দাবিতে সভা বসছে।[১১৯]

লেখক 'বাহাদুর বাঙালি', 'বীরাঙ্গনা', 'পিতা', 'যৌতুক' প্রভৃতি গল্পে স্বদেশ-বিরোধী শক্তিকে নির্মমভাবে কশাহত করেছেন। লেখক যখন কিছু বলেছেন তখন ভর্ৎসনা একটুও আবরণ রাখেনি।

(ঘ) ইংরেজ-সরকার ও ভারতবর্ষের নেতাদের কর্মকাণ্ডের এবং ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধের প্রসঙ্গগুলো তাঁর কিছু কিছু গল্পে সমাজ-বাস্তবতার উপাদান হিশেবে কম-বেশি ঢুকে পড়েছে। যেমন:

১. ইংরেজ-সরকার তাকে ক্ষমতা দেয় তার অঞ্চলের অপরাধীকে ছয়মাস পর্যন্ত বন্দি করে রাখার।[১২০]
২. গান্ধীজি তাঁর স্বদেশে মেথর জাতীয় অস্পৃশ্যদেরকে হরিজন বা ভগবান-পুত্র বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার স্থিতিস্থাপকতার শক্তি এত প্রবল যে, কোনও সংস্কারই স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি, বরং এর বীজানু মুসলিম সমাজেও সংক্রমিত হয়; দুর্বল মনের মানুষই সহজে শ্রেণীস্বার্থে উজ্জীবিত হয়, 'আমি অমুকের চেয়ে বড়ো'–এমন মনোভাবের পুষ্টি সাধনে।[১২১]
৩. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভুল মতবাদের উপর ভিত্তি করে।[১২২]
৪. আর্মির অধিকাংশ লোক গোঁয়ার-গোবিন্দ শ্রেণীর, জ্ঞানালোক বঞ্চিত, মওদুদী-মৌলোভী দ্বারা পরিচালিত, তাই তারা জানে না মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানসহ তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্মস্থান ছিল বর্তমান হিন্দুস্থানেই। এমনকী বাঙালি হত্যাযজ্ঞের দুই নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো হিন্দুস্থানের আলো-বাতাসে মানুষ হলেও ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের আবহাওয়া তাদের আস্ত হায়ওয়ান বানিয়াছে, তারাই মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত, তাই বলছেন যে, পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ মানুষ অমুসলমান, তাদের হত্যা করা যায়েজ।[১২৩]

(ঙ) বাংলাকে মুক্ত করতে যে বিপ্লবীরা কাজ করে তাদের প্রতি কিছু কিছু গল্পে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্লবীকে নায়ক করে লেখা 'অপেক্ষা' এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আবদুর রউফ চৌধুরীর বিপ্লবী পদ্ধতি কতটা কার্যকর বা মান্য সে-বিষয়ে যতই প্রশ্ন থাক, তবে তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত বাণী যে অহিংস আত্মসমর্পণের নয়, বরং সশস্ত্র আন্দোলনের সে-বিষয়ে সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে 'অপেক্ষা', 'বীরাঙ্গনা', 'পিতা' ইত্যাদি।

---

[১১৫] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৬] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৭] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৮] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১১৯] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২০] ট্যাকরা-ট্যাকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২১] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২২] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৩] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

**(তিন) নারীঘটিত সামাজিক সমস্যা**

'গল্পভুবন' ও 'গল্পসম্ভার'তে আবদুর রউফ চৌধুরী নানা স্বভাবের নারীচরিত্র তৈরি করেছেন। তাদের জটিল মন, তাদের রহস্যময় ব্যক্তিত্বের মুখে পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন। এসব সৃষ্টি সাহিত্য-ভোক্তার কাছে পরম প্রাপ্তি।

নারী প্রসঙ্গে একমুঠো উদাহরণ:

১. চোখ বুঁজে পুরুষগুলো যেন অনুভব করতে চাইল সুন্দরীর গভীরে অনুপ্রবেশ করে বীর্যস্খলনের আনন্দ, আর যখন তারা একে একে চোখ খুলল তখন দেখা গেল রমণীর সর্বস্ব লুটে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে ঝিলিক মারছে শুধু।[১২৪]

২. সব নারীই তো চায় সংসার ও সুখ, টাকাওয়ালা পুরুষ! হয়তো সবই ভুল।[১২৫]

৩. যৌনস্বাদ উপভোগ করার জন্য একজন পুরুষ পাবে সত্তরজন হুরী, তাহলে একজন বেহেশতি নারী কতজন তাগড়া মরদ পাবেন তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে?[১২৬]

৪. দুটো বখাটে ছোকরা কৃষক-বৌয়ের লাল পোশাকটি নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে। পটপট বুট ভাঙছে আর মাঝেমধ্যে খিলখিল করে হেসে উঠছে। একইসঙ্গে অস্পষ্ট অশ্লীল গান, ফাঁকে ফাঁকে মৃদু শিসও। কৃষক-বৌ অবলার ভঙ্গিতে নিজের হাত নিজে ডলছে। মুখ টিপে চোখের ইশারায় তার পাশে বসা লোকটিকে কী যেন অনুরোধ করার চেষ্টা করছে; হয়তো-বা তাকে এখান থেকে অন্য বগিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছে।[১২৭]

৫. নারীকে বন্ধুর আসনে বসানোর পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য মনে করা হচ্ছে। নারীকে শুষে, জুলুম করে ক্রীতদাসীর চেয়ে অধম ও হীন ভূমিকায় নামিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ আনন্দ উপভোগ করছে। পুরুষ শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা যেন মানবিকতার উপর ধর্ষণ চালিয়ে নারীকে কিছুটা আর্থিক ও সম্পত্তির অংশ দিয়ে কেড়ে নিয়েছে তার অধিকার; এরইসঙ্গে একজন স্বামীকে, টাকার বিনিময়ে, স্ত্রী লাভের সহজ পন্থাটি বাতিয়ে দিয়েছে। পুরুষরা নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে। নারী তো আর পুরুষের ক্রীতদাসী নয়।[১২৮]

৬. শিশু জন্মদানের সিদ্ধান্ত যে নিতে পারে, সে কেন পারবে না তার ভবিষ্যতের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতে? মানুষ তৈরির কারখানার প্রধান মিস্ত্রিকে অবজ্ঞা? অজ্ঞতার অজুহাতে অপরাধ ঘুচে না।[১২৯]

৭. নারীনির্যাতনে সমাজের নীরবতা সত্যি বিস্ময়কর। [...] একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ হয়ে যায় পতি, স্বামী, প্রভু; আর নারী পরিণত হয় সেবাদাসীতে।[১৩০]

৮. আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য নারী-স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের সোচ্চার হতেই হবে।[১৩১]

৯. দোজখযন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও তার মা কেমন হাসিমুখে সেবা করে চলেছেন তার স্বামীকে, আদরযত্নে ভরে দিচ্ছেন তার সন্তানের জীবনতরী—এসব ভেবে বিস্ময়াভিভূত সফিক শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে চাইল তার হতভাগী জননীর কদম-মুবারকে। কিন্তু...।[১৩২]

১০. একজন নারী ও একজন পুরুষ যে কাজটি উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছে, অতি গোপনে সম্পন্ন করে, সে-স্থানে, সে-সময়ে চার ব্যক্তির উপস্থিতি কল্পনাতীত, তা একমাত্র সম্ভব ধর্ষণকালে যদি ধর্ষিতার চিৎকারে চার ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়। কাজেই মনে হয়, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ ধর্ষণকারী পুরুষের প্রতিই প্রযোজ্য, নারীর প্রতি না; কারণ, নারী শুধু তো অত্যাচারের শিকার।[১৩৩]

সমাজতত্ত্বঘটিত সন্ধানে নারীদের প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দুটি কারণে:

১. গল্পকার গভীর ও ব্যাপকভাবে নারীদের অবস্থান, তাদের স্বাতন্ত্র্য, সমাজ-সময় মিশিয়ে রেখেছেন তাঁর বহু কাহিনীতে।

২. সমকালীন সমাজ-জীবনে নারীদের কেন্দ্র করে অনেক বাড়তি সমস্যা চারদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রেখেছে। সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। গেলে সমাজ-বাস্তবতার একটি বৃহৎ অংশ বাদ পড়ে যায়। লেখক এ-সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে নারীরা পণপ্রথা-বহুবিবাহ-তালাক-জিনা প্রভৃতি সামাজিক বিধানের দ্বারা বিশেষভাবে নিত্য পীড়িত হয়েছে। ভিন্ন জাতিবর্ণে বিয়ের ফলে ধর্মের ছুরির আঘাত। ধর্ষণ ও কুসংস্কারের ফলে লাঞ্ছিত হয়েছে। সংসারজীবনে নিত্য অবহেলা ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে। কখনও নীতিহীনতার পঙ্কে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ বিদ্রোহও করেছে। পারিবারিক-

[১২৪] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৫] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৬] সৃষ্টিতত্ত্ব, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৭] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৮] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১২৯] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩০] ট্যাকরা-ট্যাকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩১] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩২] পরিচয়, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৩] জিনা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নারীর ছবিও আছে। 'যৌতুক' গল্পের এক নারী পণপ্রথার বলি। সেখানে লেখকের ভর্ৎসনা সরাসরি সামাজিক কুপ্রথাকে আহত করেছে। 'বিকল্প' গল্পের জায়েদা পিতৃগৃহে পণপ্রথার কারণে পীড়িত হয়েছে। লেখক দুটি গল্পেই সূক্ষ্ম মানসিক পীড়নের ইঙ্গিত করেছেন, তাতে কঠিন নিষ্ঠুরতা কিছু কম প্রকাশ পায়নি। 'ট্যাকরা-ট্যুকরি'র কাহিনীতে বংশমর্যদা, কুসংস্কার ও শিশুমরণের ঘটনা আছে। 'আত্মব্রত' গল্পে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে যে সমস্যা তৈরি করেছে তার জোরটা মনস্তত্ত্বে। 'শাদী' গল্পে নারী বোবা বলেই বিয়ের আসন থেকে নতুন বর উঠে যায়, আর বোবা জেনেই সমশের তাকে নির্দ্বিধায় বিয়ে করে। 'রাণী' গল্পের মূল বিষয় অবহেলিত নারীর অন্তর্দাহ এবং স্বামী-বন্ধুর যথার্থ পরামর্শে স্বামীর মানসিক কামনাকে অনুধাবন করতে পারায় স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় পাপ পথ থেকে। নীলা ও রেখার স্বামীগৃহ ত্যাগ ও বাইরের ঘটনাগত রূপ তাদের বিদ্রোহের অংশ। তারা স্বতন্ত্র মানুষ। সাংসারিক পীড়নের স্থূলতায় আক্রান্ত না-হলেও নারীর মূল্য যে কোথায়, পরিবারের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় তারা শিখেছিল। নীলা ও রেখা তাদের ভাগ্য নিয়ে লড়েছে। এ যুদ্ধ শুধু নিজেদের জন্য নয়, নারীর মানবিক মূল্যের জন্য। 'আত্মব্রত' গল্পের রেখা হেরে গিয়েও আত্মসমর্পণ করেনি। স্বামী-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে নিজের জন্য দুরন্ত-পথ খুঁজে নিয়েছে।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে নারীদের সামাজিক সংস্থানকে সমকালীন বাস্তবতার উপস্থিত করা হয়েছে।

### (চার) নবপ্রজন্মের দূরত্ব

লেখক কেন বাস্তব জীবন এবং সামাজিক মানুষের কথা সোজাসুজি প্রবন্ধের মাধ্যমে না বলে এরকম একটা পথ ধরলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কখনও কারণটা পুরো শিল্পগত, কখনও সমাজতাত্ত্বিক, বিংবা দুয়ের মিশ্রণও হতে পারে। গল্পকার যে-কথা বলতে চান যদি সেখানে প্রতীক বা রূপকের আড়াল না থাকে, না-থাকে ভাষা-শব্দ-বর্ণের প্রাচুর্য তো নগ্নসত্যের তীব্রতা প্রকাশে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বক্তৃতা। সাহিত্যসৃজন হয় না। লেখক চতুর কৌশলে তা এড়াতে চান। সে যাই হোক কারণটা কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক। আবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বক্তব্য সোজাসুজি প্রকাশ পায় না বলেই, সমাজবাস্তবতা কিছু ঢাকা আর খানিকটা খোলা থাকার জন্যই এসব ক্ষেত্রে অভিপ্রেত অনুসন্ধান জটিল হতে বাধ্য। সব যুক্তি ভেঙে দিয়ে তবুও বলা যায় যে, আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে আছে:

১. সামাজিক বিধি-নিষেধ-বিশ্বাস দিয়ে গড়া জীবনের বাস্তবতা ও জাগরণ।
২. স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান-বিপর্যয়, নারীর অবনমন ও বঞ্চনা।
৩. সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও রুচি ডিঙিয়ে সত্য হয়ে ওঠে বঞ্চিত মানুষের বাস্তব জীবন।

পণপ্রথা, তালাক প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাকে আঘাত করে যুবকরা পিতা বা শ্বশুরের বিরোধিতা করেছে। 'যৌতুক' ও 'বিকল্প' গল্পে ব্যাপকভাবে দেখলে বলা যায় রক্ষণশীল সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে প্রগতিবাদী তরুণদের বিরোধের কাহিনী এগুলো। দুই পুরুষের সংঘষের রূপ নিয়েছে গল্পে। সে কারণে সিদ্ধান্ত, গল্পকার দুই প্রজন্মের জীবনবোধের পার্থক্য হিশেবেই এখানে একে দেখাতে চেয়েছেন। গল্পগুলোতে নবপ্রজন্মের প্রতি লেখকের সমর্থনের উত্তাপ অনুভব করা যায়, সমস্যাপূরণেও। গল্পকারের সমাজ-বাস্তবতার বোধ যে তীক্ষ্ণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

'নীলা' ও 'জিনা' গল্পগুলোও দুই প্রজন্মের জীবনবোধের সংগ্রাম। 'নীলা' গল্পে কাকা ও ভাই-ঝি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রতি মনোভাবে, ব্যক্তিগত বাসনায় বা দয়া বিতরণে– জীবনধারণের প্রাত্যহিকতায় দুই পৃথিবীর মানুষ অর্থাৎ দুই প্রজন্মের। একজনের ভাষা অন্যের নয়, কাকা ও ভাই-ঝির মধ্যে দুস্তর দূরত্ব। 'জিনা' গল্পেও নবপ্রজন্মের গঠিত ঘটনা নিয়ে পূর্বপ্রজন্মের লড়াই।

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে 'প্রজন্মের দূরত্ব' বিবিধ বাস্তব সামাজিক সমস্যা, চেতনার আন্দোলন, ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এসব ভাবনার যে একটি বিশেষ বাস্তব দিক আছে সে-বিষয়ে গল্পকার হিশেবে তাঁর চেতনা অসীম।

### (পাঁচ) জীবনচিত্রে বিবিধ সমাজসমস্যা

'জিন' ও 'ভূত ছাড়ানো' গল্পে ধর্মীয় কুসংস্কারের এক চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সত্য ধরা পড়েছে। অনেক ঘটনা যা কদাচিৎ ঘটে, যাকে চিন্তাহীন মন আকস্মিক ও ব্যতিক্রমী মনে করে, তার মধ্যেই সমাজের গভীর পাপ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি প্রতিফলিত হয়। সব মিলে জনসংঘের নির্বোধ ধর্মীয় কুসংস্কারের উপর যে কষাঘাত এই গল্প-দুটো– তা সর্বকালে ছড়িয়ে পড়ে এবং লেখকের সমাজ-চৈতন্যের ব্যাপকতার নিদর্শন হয়ে থাকে।

ধর্মান্ধ কুসংস্কারের প্রতি বেদনাদীর্ণ ভর্ৎসনার গল্প 'ট্যাকরা-ট্যুকরি'। পিতা পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে রুগ্ন সন্তানকে পীরের মন্ত্রপূত-জলে, তাবিজে, ঝাড়ফুঁকে তার সব ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। ফলে পিতাই নিজ সন্তানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। লেখক

সংস্কারমূঢ়তাকে আহত করার প্রয়োজনে, পিতাকে ক্রুদ্ধ আঘাত করার নির্মমতায় মাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেন। আলোচ্য গল্প তাই সমাজ-বাস্তবতার গভীর প্রতিবিম্ব।

নিষ্কৃতি নারীদের চিত্তমুক্তির কাহিনীও বটে 'আত্মব্রত'। রেখার কাছে স্বামীর বা সমাজের মুখোশ খুলে কুৎসিত ভণ্ডামি বেরিয়ে পড়লে, 'এক সন্ধ্যায়, সন্তান-দুটো নিয়ে রেখা এক নবীন এঞ্জিনের সাহায্যে ও যুবক-পাখায় ভর দিয়ে উড়ে গেল; নতুন প্রেম লাভের, ঘর বাঁধার এবং পুরুষচিত্ত জয় করার আশায়।'[১৩৪] রেখা যুবকের সঙ্গ নিয়ে হৃদয়ের, মনুষ্যত্বের দাবি মেনে নিল।

৬.

আবদুর রউফ চৌধুরীরর গদ্যশৈলীতে যে বিশিষ্টতা আছে তা পাঠক মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে; তাঁর ভাষা নির্মাণ ও শব্দ ব্যবহারের বিশেষ গুণগুলো কী বা তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন কীভাবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক। আবদুর রউফ চৌধুরীর ভাষা নির্মাণ ও শব্দ ব্যবহার তাঁর বক্তব্যকে শাণিত ও অর্থবহ হতে সাহায্য করেছে। প্রধানত তিনি বাস্তব জীবনের রূপকার। বাস্তবতার এই রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর ভাষা নির্মাণ। তিনি প্রধানত চলিতভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁর কোনও কোনও গল্পে সংস্কৃতাশ্রীয় অলঙ্কার-শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও গদ্যে এসেছে আটপৌরে লালিত্য। কোনও কোনও গল্পে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করে পরিবেশ ও চরিত্রের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করেছেন। শোষক ও শাসকের মধ্যে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধানটি সাধারণ বাক্য ব্যবহারে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্ণনাতে পারিপাট্য আছে, সহজ স্বাভাবিক সাবলীল তার প্রকাশ ভঙ্গি। বর্ণনায় পরিমিতিবোধ, বাক্য ব্যবহারে সংযম, ভাষা ও গতি রক্ষিত হয়েছে। আবদুর রউফ চৌধুরীর ভাষা ঋজু, স্বচ্ছন্দ, গতিময় হওয়ার পিছনে আছে তিন শ্রেণীর ভৌগোলিক পটভূমি–সিলেটের গ্রামঞ্চল, করাচি ও বিলাত। ভাষা দিয়ে গদ্যরীতিরও পরিক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর সৃজনশীল ভাষা ব্যবহারে একদিকে আছে ঔজ্জ্বল্য, প্রখরতার দীপ্তি, অন্যদিকে স্বাভাবিক স্নিগ্ধপ্রলেপ। আবদুর রউফ চৌধুরী মোটামুটিভাবে বাঙালি সমাজে ব্যবহৃত দেশজ ও আঞ্চলিক আবহ নির্মাণে সিলেট অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। 'জিন', 'উপোসী', 'পিতা', 'বিকল্প', 'শাদী', 'ট্যাকরা-ট্যুকরি', 'ভূত ছাড়ানো', 'যৌতুক' গল্পের কিছু কিছু বাক্যালাপ লেখক আঞ্চলিক ভাষাতে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

১. 'গেছি তো ভালাই করছি। তুমি অত ভাবীর কথায় নাচ কিয়র লাগি কওছান হুনি?'[১৩৫]
২. 'সেন্ডেল আত নিলেঐ অইত।'/ 'ডর লাগতাছে।'/ 'আয় অখন উঠি। বাপ ঠাকুরদা'র ভিটর সন্ধান তো করন লাগব।'[১৩৬]
৩. 'কিতা চাও তরমুজ?' / 'গরিবর আর কিতা চাইবার আছে।' / 'ধার-টার চাউ না কিতা?' / 'ধার কেটাই-বা দিব।'[১৩৭]
৪. 'আপনার হউর [...] কোঁচ দিয়া মাছ শিকার করাত ওস্তাদ। গতকল্য ইয়া-বড় একটা কাতলা কাবু করছইন। দেখইন কেমন তেলতেলা চেপটা পেটি।'[১৩৮]
৫. 'নীলাম্বরী একখানা শাড়ি লইলে পুরিটা খুশ অইব, অবশ্য হলুদ পাড়ওয়ালা শাড়ি তার খুব পছন্দর। ছয়মাস আগঅ তোমার কাছ থাক্কাই পাক্কা দশ হাতর একখানা চেকর শাড়ি নিছলাম, অখনও রঙ যায় নাই।'[১৩৯]
৬. 'পুয়া তাকিয়াও নাই। হকলতাই কপাল বাবাজি। কপালের লেখন খণ্ডাইতে পারে কেটা!'[১৪০]
৭. 'বাবা শাহজালালের দরগা থাকি তাবিজ আইন্যা দিছিলাম। ছিঁড়িয়া ফালাইয়া দিল।'[১৪১]
৮. 'মাইয়ার বাবাজান নাকিতা কইছলাইন একটা হুন্ড্যা দিবা, আমার হুজুরঅর ভরসায়। আমার হুজুর নাকিতা হিসময় বাসঅ ক্যানভাসর কাম করতাইন। আর বোইনর বাড়ি তাকতাইন। হিসময় তানঐর ভাগ্নি খুব যত্নতালাবি করতা। হুজুর তানঐর ভাগ্নির খুব আদর করতাইন। আহা, আমার হুজুরঅর স্নেহর ভাগ্নিটার ঐ দুষমনরা হত্যা করইয়া পালাইচে। হুজুর বইয়া বইয়া চোখঅর পানি পালাইতাচইন।'[১৪২]

অন্য গল্পগুলোতে বাক্যালাপ হয় শুদ্ধ চলিত বাংলায়। আবদুর রউফ চৌধুরী নিজেকে অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী লেখক হিশেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা শব্দ চয়নে তাই বাঙালির প্রতিদিনকার ব্যবহারিক শব্দ, তাঁর গল্প রচনায়, প্রধানত অবলম্বন করেছেন; তবুও কিছু মুসলমানি শব্দ অনিবার্যভাবেই এসেছে, এতে ঘটনা, চরিত্র এবং পটভূমির একটি স্বাভাবিক গতি সঞ্চরিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য :

[১৩৪] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৫] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৬] পিতা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৭] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৮] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৩৯] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪০] ট্যাকরা-ট্যুকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪১] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪২] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

১. যৌনস্বাদ উপভোগ করার জন্য একজন পুরুষ পাবে সত্তরজন হুরী, তাহলে একজন বেহেশতি নারী কতজন তাগড়া মরদ পাবেন তার যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যে?[১৪৩]

২. তালাক দিতে হলেও স্ত্রীর উপস্থিতি প্রয়োজন। শরিয়ত সম্মত কথা।[১৪৪]

৩. সামসের নগর নিবাসী জনাব আব্দুস সাত্তার মিয়ার প্রথম পুত্র আব্দুস শহীদের সঙ্গে ইসলামিক শরাশরীয়ত মতে পঞ্চাশ হাজার টাকা কাবিন নামার মাধ্যমে চার ইমামের অনুমোদিত পন্থায় বিয়ের পয়গামে তোমার সম্মতি থাকলে 'কবুল' বা 'বিসমিল্লাহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বা 'হুঁ' বলো বা অমনি ধরনের একটি সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দাও।[১৪৫]

৪. সুয়ামীর পাউওর নিচ হিস্ত্রীর বেহেশ্ত। এ-শিক্ষা দিছ না তোমরা পুরিটা'র?[১৪৬]

৫. বাদ মাগরেব, ঘরের ভেতর বসে কাঁঠাল ও সীম বীজের সমন্বয়ে পাকুরা খেতে খেতে, পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে, আঙুল নেড়ে, কালো লম্বা দাড়ি দুলিয়ে, মুকিদপুর আলিয়া মাদ্রাসার হেডমোওলানা আজিজুর হক ব্যাখ্যা করছেন ফতোয়ার ফাঁকফোকর।[১৪৭]

৬. স্বামীর মৃত্যুের পর চার মাস ইদ্দত পালন; [...] তালাকের পর তিন মাস ইদ্দত পালন; [...] হাশরে শাস্তির পরিমাণ পুরুষের অর্ধেক [...]।[১৪৮]

৭. মক্কা শরীফের মসজিদের সামনে জিনা অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত নারীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, ঢেকে দেওয়া হয় তাকে কালো কাপড়ে। নামাজ শেষে পূণ্যাত্মা মুসল্লিরা পাথরের ঢিলা দিয়ে একে একে আঘাত করতে থাকেন কালো কাপড়ে আবৃত মাথাটিকে।[১৪৯]

আবদুর রউফ চৌধুরী সমন্বয়ের সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলাম অনুষঙ্গে প্রয়োজনমতো আরবী-ফার্সী শব্দ তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেছেন, আবার দুই বাংলা মিলিয়ে যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ তাও প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য:

১. বাদামকালো ছনগুলো বৃষ্টির জলে ঢলঢল, কয়দিন ধরেই বৃষ্টি চলছে–সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, শুধু বর্ষণ; আবার মাঝেমধ্যে তুফানও–ক্রুদ্ধগর্জনে, বিষাক্তনিশ্বাসে ছোবল মারছে ছনের চালে, একইসঙ্গে সাপের মতো বিদ্যুতের দলও নেচে উঠছে মেঘের আড়ালে, বজ্রপাতের মাঝেও যেন শোনা যায় ইস্রাফিলের হুঁঙ্কার, বীণার ঝঙ্কার। [...] চাঁদের স্নিগ্ধতা নিয়ে উদয় হল শেখের ঝি, মাফিকের স্ত্রী, স্বামীকে উদ্ধার করার জন্যে যেন রহিমা-সীতা।[১৫০]

২. রঙধনু যেমন শারদীয় বিকেলের আকাশে শতগুণ শোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি দেবীর শাড়ির বিবিধ রঙের পাড়ের মধ্য দিয়ে ব্রা-ব্লাউজ ছিঁড়ে বোঁটা-দুটো যেন আত্মপ্রকাশে মাতুয়ারা, লালায়িত।[১৫১]

৩. বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ বিফল মনোরথে ফিরে এসে উপস্থিত হন নিম্নশ্রেণীর আরেকদল শূদ্রের কাছে। কিন্তু তাদের একই কথা। সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধন, অন্যথায় বৃথা সবরকম কথোপকথন। অন্যকোনও উপায় না-পেয়ে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-সম্রাট সম্মত হন তাদের জাতীয় নাম শূদ্রের সঙ্গে নমস্য যোগ করতে। কালোক্রমে ওরা দেবতার পুত্র বা নমঃসূত নামে অভিহিত হয়। বাঙালির আবিষ্কৃত এ-পদবীর অনুকরণে গান্ধীজি তাঁর স্বদেশে মেথর জাতীয় অস্পৃশ্যদেরকে হরিজন বা ভগবান-পুত্র বলে আখ্যায়িত করেন।[১৫২]

৪. কর্নেল জাবেদ একেবারে 'থ' হয়ে গেল, ধ্রুপদীর বস্ত্রহরণে অপারগ দুর্যোধন যেন।[১৫৩]

৫. জৈন্তার রাজবংশের এক উত্তরাধিকারী শিবচন্দ্র নারায়ণ বাবুর শানশওকত কিংবদন্তী তুল্য ছিল। তিনি নাকি গৌহাটী যেতে পারতেন পরভূমে পা না ফেলে। তারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় শিবসাগর দীঘি।[১৫৪]

শব্দের প্রয়োগে উপমা ব্যবহার বা নির্মাণের ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন আবদুর রউফ চৌধুরী। কয়েকটি উদাহরণ :

১. তার বাহুলগ্ন প্রেম-অপরিবর্তন হরিণাক্ষী একটি নারী, সে এক শিশুর স্নিগ্ধপ্রজ্ঞাসম্পন্না জননী, যার অপরূপ সৌন্দর্য যেন পঞ্চমহাভূত প্রকৃতির গর্ভজাত সৃষ্টি, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রথম সূর্যের স্বতঃস্ফূর্ত শিশিরসিক্ত আলো, তৃষিত পৃথিবীর একপশলা বারিসিক্ত বৃষ্টি, রাত শেষে উদিত নক্ষত্রকুলের সুন্দরতম ধ্রুবতারা, ঊষালগ্নের স্থির উজ্জ্বল জ্যোতির দ্যোতিত, শাশ্বত অন্তবিরামহীন পূর্ণিমার চাঁদ, অপরূপ ও সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত একটি মূর্তি, তবে ভীতু মূর্তপ্রতীক যেন।[১৫৫]

---

[১৪৩] সৃষ্টিতত্ত্ব , গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৪] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৫] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৬] ট্যাকরা-ট্যুকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৭] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৮] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৪৯] জিনা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫০] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫১] বন্ধুপত্নী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫২] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৩] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৪] ট্যাকরা-ট্যুকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৫] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

২. আমেনার দেহখানা যেন আখনপাতার মতো বিধ্বস্ত।/ [...[ যেন তেলসিক্ত লাল মরিচ–শয়তানের ত্রিশূল; [...]।[১৫৬]

৩. খরায় চৌচির হয়ে যাওয়া মৃতপ্রায় ফসলক্ষেতে যদি অনর্গল বৃষ্টিপাতে প্রাণ ফিরে পায় তাহলে চাষীর মনে যেরকম আনন্দ সৃষ্টি হয় সেরকম অবস্থাই তার।[১৫৭]

৪. বৌদির গাল-দুটো ফাগমাখা হয়ে উঠল, যেন অমাবস্যা পা পিছলে আগ্নেয়গিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। [...] তারপর বৌদি কিছুক্ষণ অসমাপ্ত কবিতার হিজিবিজি অক্ষরে কলম থেমে থাকার মতো ভঙ্গিতে বসে রইল।[১৫৮]

৫. ক্লাইভের খঞ্জর তারা উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়েছে বলেই হয়তো এমন করছে![১৫৯]

৬. এই কান্না যেন অপরাজিতের গায়ে প্রজাপতির উড়ে বেড়ানোর মতো ঝিলিক দিয়ে বরফগলা নদীর মতো গড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে তার গাল বেয়ে।[১৬০]

৭. মেঘযুক্ত আকাশের মতোই আবছা, স্যাঁতস্যাঁতে একটি নিঃসঙ্গভাব বাড়ির দেওয়ালে নকশি কাটে।[১৬১]

৮. নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে আছে, [...]।[১৬২]

৯. চাউনি যেন অপহৃত গৃহস্থের গৃহের মতো শূন্য, তবে এলোমেলো; [...]।/ [...] তার যন্ত্রণাময় জীবন যেন এক কাঁটাওয়ালা বিষাক্ত ফুল, পৃথিবীর পরিত্যক্ত বস্তু।[১৬৩]

১০. যেন দাদীর ঝাঁপিতে সযত্নে রক্ষিত দাদার বহুকালের দ্রব্যে ইঁদুর পড়েছে; তাই হাসতে গিয়েও তার সারা মুখে ছেঁড়া-দুধের ঘোলাটে রূপ ধারণ করল। [...] বন্যার রাক্ষুসী থাবা থেকে বেঁচে যাওয়া গৃহস্থের গোলায় তুলে রাখা পরিশ্রমের ফসল যখন মহাজনের পাইক এসে নিয়ে যায়, লগ্নি টাকার চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ গণনা করে, সাকুল্য পাওনা হিশেবে, তখন ব্যথাক্ষুব্ধ অসহায় গেরস্থ-বউয়ের অন্তরে যেমনি আলোড়ন সৃষ্টি হয় তেমনি জায়েদার অবস্থা, পিতৃ-আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে অতি কষ্টে সে তার পা-দুটো টেনে নিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে।[১৬৪]

১১. দুপুরের ধুলাচ্ছন্ন সৈনিকছাউনি ও জনহীন পথটি যেন মরীচিকার জাল, কর্মশালা থেকে আসা পরিশ্রান্ত এই সৈনিকটি হঠাৎ বাঁধমুক্ত নৌকার মতো স্থির একটি স্রোতে ভেসে এখানে আমার দৃষ্টির সম্মুখে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন কেন?[১৬৫]

১২. [...] তোমার শরীর তো পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ [...]।[১৬৬]

১৩. জোড়াতালি দেওয়া পালের মতো জাবেদের দৃষ্টি, যদিও তীরের মতো ছুটে চলেছে তার বোট।[১৬৭]

১৪. [...] পালশূন্য চৈত্র-দুপুরের তেজময় সূর্যটি মেঘশূন্য আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।[১৬৮]

১৫. অর্ধেক-খাওয়া দুধের বোতল মুখ থেকে সরিয়ে নিলে শিশুর মুখের যে অবস্থা হয়, কাঁদার পূর্বাবস্থা, তেমনি মুখ করে কুবেরের ধন পঞ্চাশ টাকা জিনসাধক সৈয়দ আকমল আলীর হাতে তুলে দিল সে।[১৬৯]

১৬. উচ্চস্বরে হেসে উঠল সে। তার অট্টহাসির শব্দে শঙ্কিত হয়ে উড়ে গেল একজোড়া পায়রা–খাবার ফেলে, প্রাণের ভয়ে। তবুও তার হাসি থামল না।[১৭০]

১৭. মাওলানা মোহম্মদ আব্দুস সবুর আখন্দের ভাষায় যেন ঈশান কোণে কাল-বৈশাখীর ঘূর্ণিবার্তা প্রকাশ পেল [...]।[১৭১]

১৮. সে বিমর্ষ বিহ্বল, তবে তার অন্তরে পাম্পী-ধ্বংসের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যেন।[১৭২]

১৯. তার মাথায় পিঞ্জরাবদ্ধ অদৃশ্য পাখির মতো নীলার চিন্তাগুলো উড়ে বেড়াবে।[১৭৩]

এরকম সাধারণ উপমা-নির্মাণে তিনি জীবনের অম্লমধুর চিত্রই উন্মোচন করেছেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর নিজস্ব নির্মিতি। তাঁর প্রতীক ব্যবহারও দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সফলতা অর্জন করেছে। প্রতীক ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ :

---

[১৫৬] জিন, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৭] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৮] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৫৯] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬০] পিতা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬১] নেশা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬২] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৩] নীলা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৪] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৫] বন্ধুপত্নী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৬] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৭] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৮] ট্যাকরা-ট্যুকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৬৯] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭০] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭১] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭২] পরিচয়, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৩] জিনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।

১. [...] বিক্ষুব্ধপ্রকৃতির প্রতিশোধাত্মকরোষের একটি চিহ্ন–প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ছলনামূলক সর্বগ্রাসী কংক্রিটের তৈরি রেলস্টেশনটি।[১৭৪]

২. [...] ছোট টেবিলে সযত্নে রাখা বেশখানিক দুধ পড়ে থাকা বোতলটি নিঃশব্দে তরমুজের কর্মকাণ্ড দেখছে।[১৭৫]

৩. ভদ্রলোকটি ধীরস্থির পায়ে একটি মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলেন, ওর গায়ে লেখা আছে–'ব্রিলক্রিম। আমাকে ব্যবহার কর।'[১৭৬]

৪. যে-রাস্তা তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে মূলসড়কে গিয়ে মিলেছে তার খালবাকল উঠে গেছে।[১৭৭]

৫. রেলগাড়ি ছুটে চলেছে [...] নানারকম গাছগাছালি, ভাঙা ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত-মাঠ পিছনে ফেলে।[১৭৮]

৬. [...] নদীর চরে, দুপুরের আকাশে, যে লুব্ধ গৃধ্রের দল অধীর আগ্রহে উড়ছিল [...]।[১৭৯]

৭. [...] টেপ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়াচ্ছে।[১৮০]

৮. হাজী মজনু তার দৃষ্টি সরিয়ে স্থাপন করলেন বেঞ্চের পায়ে জড়িয়ে থাকা একটি জং-ধরা পুরোনো টিনের কৌটোর ওপর; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জঞ্জালই যেন এর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।[১৮১]

৯. অন্ধকার হচ্ছে মহাসত্যের সোপান, শৃঙ্গের অবারিত প্রহরীমুক্ত দ্বার।[১৮২]

১০. [...] হাতলভাঙা টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুয়ে [...] এগিয়ে এল বাংলাঘরের দিকে [...]।[১৮৩]

১১. [...] অলকনন্দার কুঞ্জতলের আরেকটি কৃষ্ণচূড়া।[১৮৪]

১২. [...] বাতাসে দোল-খাওয়া জালটি অদৃশ্য চিলের পাখা-ঝাঁপটানোর মতো আড়াল করে রেখেছে মাঝির মুখটি।[১৮৫]

১৩. [...] কুশিয়ারা নদী কলতানে বলে যাচ্ছে–ভয়ের শেষ যেখানে, নির্ভয়ের জন্মই সেখানে।[১৮৬]

১৪. [...] একটি আম টুপ করে জলে পড়ে ডুব দিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেসেও উঠল, তবে মাথা নত হয়েই রইল।[১৮৭]

১৫. মদরিছ তার বালিশের ক্যাভারের ভেতর থেকে টাকা বের করে আনল।[১৮৮]

১৬. [...] বিড়ালের ভুঁড়ির ওঠানামার [...] মাঝে তিনি দেখতে পেলেন তার জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা।[১৮৯]

১৭. [...] খসে পড়ল বৃন্দাবনী হুঁকোর রূপোর বাঁধানো নলটি।[১৯০]

১৮. শোবার-ঘরে ইঁদুরের মতো তেলাপোকাও কম না।[১৯১]

১৯. [...] সে যেন ভীমরুল, বোলতা, বল্লা, ভৃঙ্গরোল বা এ-জাতীয় এক পোকা, তবে রোগা, ছোট এবং দুর্বল; [...]।[১৯২]

আবদুর রউফ চৌধুরীর গল্পে জীবনদর্শন আছে, আছে মননশীল চিন্তার অবকাশ, তবুও তিনি পাঠকের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে দার্শনিক হতে চাননি। তিনি জীবনের রূপকার। জীবনের রহস্য, সমস্যা, দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছেন মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। তিনি মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের গভীরে অবগাহন করেছেন। এই রহস্য সৃষ্টিতে তিনি যে ধারাক্রম নির্মাণ করেছেন তা একটি বিশ্বস্ত ভুবন রচনার সহায়ক হয়েছে। সম্ভাব্য ঘটনা এবং বিশ্বস্ত চরিত্রায়নের মধ্যে এসেছে এই সফলতা। তাঁর সৃষ্ট গল্পের আবহে আছে একধরনের প্রখরদীপ্তি, যার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে তীক্ষ্ণ, জীবনঘনিষ্ঠ ও অর্থগাঢ় তাঁর এই আলেখ্যরাজি।

ড. মুকিদ চৌধুরী

লণ্ডন।

---

[১৭৪] রানী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৫] উপোসী, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৬] স্নান, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৭] সৃষ্টিতত্ত্ব, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৮] অপেক্ষা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৭৯] পিতা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮০] নেশা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮১] আত্মব্রত, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮২] নীলা, গল্পভুবন, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৩] বিকল্প, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৪] বন্ধুপত্নী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৫] শাদী, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৬] বীরাঙ্গনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৭] ট্যাকরা-ট্যাকরি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৮] ভূত ছাড়ানো, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৮৯] বাহাদুর বাঙালি, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৯০] যৌতুক, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৯১] পরিচয়, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।
[১৯২] জিনা, গল্পসম্ভার, আবদুর রউফ চৌধুরী, ২০১১।